নিষিদ্ধ অরণ্য

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

প্রস্তাবনা

ইন্দ্রের তখন ভূতগ্রস্ত অবস্থা। প্রজ্ঞার চোখদুটি দেখলেই তার মনে হত, কোথায় এইমাত্র সূর্য উঠল! আসলে কোনও-কোনও মানুষের কাছে নিজের যৌবন সমস্যা হয়ে ওঠে। ইন্দ্র ছিল সেই মানুষ। তার বয়স তখন টায়ে-টোয়ে পঁচিশ বছর। নিজের যৌবন নিয়ে খুব চিন্তাভাবনা করত। সে নিজে এক এবং তার যৌবন আরেক, এরকমই ধারণা হত। তাই বঙ্কিমচন্দ্রের ঢঙে 'এই যৌবন লইয়া কী করিব' ভেবে অস্থির হত। আর সেই অস্থিরতা থেকে সে চারপাশে কী এক অদ্ভুত আঁধার দেখত! আঁধারের অনেক রহস্য থাকে। দিনমণির মেয়ে প্রজ্ঞাকে একটি রহস্য বোধ হওয়ায় স্বাভাবিক পরিণাম ইন্দ্রের একতরফা প্রেম এবং ওই সূর্যোদয়-অনুভূতি।

দিনমণির পদবি ছিল শাস্ত্রী। বাংলাভাষী বিহারী বলে জানা যায় এবং পরে গুজব রটে, জাতনাশা বামুন। তাড়া খেয়ে বাংলা মুলুকে ঢুকেছেন। গুজবের তলায় শক্ত ঠেকা পড়ে, যখন মজহারউদ্দিনের সঙ্গে রোজ বিকেলে বেড়াতে বেরোন। এই মজহারউদ্দিনও তাঁর মতো বাইরের লোক। বীরহাটায় জমিদারি সেরেস্তার কর্মচারী। লোকেরা প্রথমে আড়ালে বলত, সুঁই হয়ে ঢুকেছে। ফাল হয়ে বেরুবে। পরে তাঁর প্রতিভার পরিচয় পেয়ে তারা খুশি হয় এবং ব্যথিতচিত্তে বলে, এমন মানুষ এখানে কেন?

ইন্দ্র ছিল জমিদারবাবু চন্দ্রনাথের ছেলে। বংশগত পদবী চৌধুরি। তিনিও বামুন। ঠাকুর্দার ঠাকুর্দা নবাবি খেতাব 'রায়-রায়ান' ভোগ করতেন। সে সব জেল্লা ক্ষয়ে যায়, আবার ফিরে আসে, আবার হয়তো ক্ষয়ে যাবে—যা নিয়ম। যাবে এই সম্ভাবনার কারণ চন্দ্রকান্তের খরুচে স্বভাব। মায়ের নামে স্কুল, দাতব্য

চিকিৎসালয়, পুজোপার্বণে জেলার কালেক্টরসায়েব আর জাতবেজাতের আমলাদের আমন্ত্রণ করে আনা, এইসব কাজ। প্রজাসাধারণ লেখাপড়াকে ভয়ের চোখে দেখত। বুড়োরা বলত, দু'কলম শিখলেই মামলাবাজ হবে। সাবধান, সাবধান।

সেই স্কুলে, যা হাই ইংলিশ স্কুল, এবং সংক্ষেপে এইচ ই স্কুল, দিনমণি শাস্ত্রী সংস্কৃতশিক্ষক। কাছারিবাড়ির একাংশে মেয়েকে নিয়ে বাস করতেন। প্রজ্ঞার বয়স লোকের হিসেবে বিয়ের বছর নিঃসন্দেহে পেরিয়ে গেছে, অথচ কুমারী! এলাকাজুড়ে বারোয়ারিতলা আর বৈঠকখানা, বনে আর শস্যক্ষেত্রে আর ঊষর প্রান্তরে, সর্বত্র কদর্য জল্পনা—গ্রাম্যতা বলা হয় যে জিনিসটাকে, ঠিক তাই-ই।

প্রজ্ঞা কি সুন্দরী ছিল? যৌবনে নাকি কুক্কুরীও সুন্দরী এমতো প্রবাদ আছে। তবে ইন্দ্র তাকে স্বর্গের অপ্সরা ভাবত এটা ঠিক। আবার এও ঠিক, বিহার মুলুকের নৈসর্গিক রুক্ষতার সঙ্গে বাংলার শ্যামলিমা মেশালে যেমনটি হয়, প্রজ্ঞার চেহারা ছিল তেমনটি। ঈষৎ পুরুষালি ছাঁদ, যা পাহাড়ি নদনদীর কথা মনে পড়িয়ে দেয়। কিন্তু অন্যপক্ষে ইন্দ্র মেয়েলি-স্বভাবী ছিল না। ঈষৎ রগচটা, হঠাৎ-হঠাৎ মারমুখী, কিন্তু সাধারণত শান্ত ও অমায়িক যুবক। কমবয়স থেকেই সে ছিল বন্দুকবাজ ও শিকারী। উড়িয়ে দিয়ে পাখি মারতে পারত। ষোল বছর বয়সেই বুনো শুয়োরএবং উনিশ বছর বয়সে বাঘ মেরে বীরের সম্ভ্রম পায়। তার গ্রামের নাম বীরহাটা বলে নয়, বীরপূজা মানুষের স্বভাব। তারা কিংবদন্তীর বীরদের পুনরাবির্ভাব কামনা করত ইন্দ্রের মধ্যে।

এই ইন্দ্র প্রজ্ঞাকে দেখামাত্র তার প্রেমে পড়ে যায়। কিন্তু বাঘ শিকারের সাহস ও দক্ষতা প্রেমের ব্যাপারে অকেজো এবং প্রজ্ঞা-শিকার খুব কঠিন কাজ টের পেয়ে ইন্দ্র দিনে-দিনে মনমরা হয়ে যাচ্ছিল। সেই ঢালাও বাল্যবিবাহের যুগে অধশিক্ষিত ইন্দ্রের কুমার থাকার কারণ তার জমিদার ও অর্ধশিক্ষিত বাবার ইংলিশ সহবত-জনিত মানসিকতা। ইন্দ্রের মা করুণাময়ী মিনমিনে গলায় কথাটি তুললেই চন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে বলতেন, 'লায়েক হোক।'

সুদীর্ঘ তিনচার মাস ধরে একতরফা প্রেমে জ্বরোজ্বরো ইন্দ্র অবশেষে এক বসন্তের বিকেলে যখন ঠিক করে ফেলেছে, প্রজ্ঞাকে ধর্ষণ করে শাস্তি দেবে, তখন একটি আশ্চর্য ঘটনা ঘটল।

কাছারিবাড়ির শেষপ্রান্তে প্রজ্ঞাদের ঘরের পেছনে একটি বাগিচা। বাগিচার একপাশে জমিদারবাড়ির উত্তরাংশ। সেখানে খোলা উঁচু শানবাঁধানো একটুকরো বারান্দা। বারান্দায় বসে ইন্দ্র প্রেমের সাড়া পেতে উদগ্রীব থাকত। উপলক্ষ

বাগিচাশোভা দর্শন, কখনও বন্দুকসাফাই। সহসা সেখানে হাজার বসন্ত ঝলমলিয়ে প্রজ্ঞার অসম্ভাব্য ও অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব ঘটল। ইন্দ্র এ-বিকেলে বন্দুক সাফ করছিল। একবার তাকিয়েই মুখ নামিয়ে পা দুখানি দেখতে থাকল। এমন এক মুহূর্ত, যখন তার যৌবন এবং সে, ইন্দ্র আরও আলাদা হয়ে গেছে। ইন্দ্রের যৌবন দেখছে ইন্দ্র কী করে, অথবা ইন্দ্র দেখছে তার যৌবন কী করে।

ইন্দ্র মখমলমোড়া একটি চারপায়ায় বসে ছিল। হাত চারেক দূরে দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞা প্রথম কথা বলল। 'ইন্দ্রবাবু, আপনার সঙ্গে একটু কথা আছে।'

এই প্রথম বাক্যালাপ। ইন্দ্র আস্তে বলল, 'উঁ' ? সে নৈর্ব্যক্তিক হয়ে পড়েছিল আকস্মিকতার দরুন।

'আচ্ছা, আপনি জানেন কোথায় অন্নদামায়ের টাঁড় ছিল ?' প্রজ্ঞার প্রশ্নে তীব্রতা ছিল।

ইন্দ্র অবাক হয়ে মুখ তুলল। বলল, 'অন্নদামায়ের টাঁড় ?' সেটা কী ?'

প্রজ্ঞা হাসল। 'টাঁড় কী জানেন না ?'

'কথাটা শুনেছি মনে হচ্ছে—লোকের মুখে।'

প্রজ্ঞা প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'শুনেছেন ? কোথায়, কোথায় সেটা ?'

মাথা ঠাণ্ডা রেখে ইন্দ্র বলল, 'না—টাঁড় কথাটা। টাঁড় মানে···'

প্রজ্ঞা নিস্তেজ গলায় বলল, 'টাঁড় মানে উঁচু রুক্ষ জমি। বীরহাটা এলাকাতেই অন্নদামায়ের টাঁড় ছিল। প্রায় বাহান্ন বিঘে মাটি। চৌকো, লম্বাটে।'

ইন্দ্র তার কথার ওপর অহঙ্কারে বলল, 'জানি না। একলপ্তে অতটা কোনও উঁচু রুক্ষ জমি এলাকায় নেই—দেখিনি। সারা বীরহাটা পরগণার প্রত্যেক ইঞ্চি মাটি আমি চিনি। আবাদি অনাবাদি সব মাটি। সব জঙ্গল।'

প্রজ্ঞা ছোট্ট শ্বাস ফেলে বলল, 'পরে হয়তো জঙ্গল হয়ে গেছে। কিন্তু ওটা ছিল।'

ইন্দ্র একটু হাসল এবার। বলল, 'হঠাৎ অন্নদামায়ের টাঁড় নিয়ে আপনার আগ্রহ কেন ?'

'মাটিটা আমি খুঁজে বের করতে চাই।'

প্রজ্ঞার কণ্ঠস্বরে একটা শীতল দৃঢ়তা ছিল। ইন্দ্র বলল, 'কেন ?' প্রজ্ঞার দূরে দৃষ্টিপাত, ঠোঁটের কোণা কামড়ানো, এসব দেখে ইন্দ্র আবার বলল, 'কেন ?'

কিছুক্ষণ পরে প্রজ্ঞা বলল, 'জানি না। কিন্তু খুঁজে বের করতে ভীষণ ইচ্ছে করে।'

ইন্দ্রের এই প্রথম মনে হল, মেয়েটি তাহলে ছিটগ্রস্তা, কিংবা চোরা পাগল,

এবং এটাই তার কুমারী থাকার কারণ। ইন্দ্র মজা পেল। তার প্রেম মজার তলায় চাপা পড়ে গেল। সে হাসতে থাকল।

প্রজ্ঞা বলল, 'আপনি হাসছেন কেন?'

এবার এই বাক্যে কাতরতা ছিল। কণ্ঠস্বর একটু ভিজে। ইন্দ্র বলল, 'যা ছিল বা আছে, তা খুঁজে বের করা যায়। যা ছিল না বা নেই, তা খুঁজে বের করা যায় না। সেজন্যই হাসি পেল।'

'ছিল।'

'বীরহাটা এলাকায়?'

'বীরহাটা এলাকায়।'

'কে বলল আপনাকে?'

'আমি জানি।'

ইন্দ্র বন্দুকটা তুলে অকারণে মাছিটাতে চোখ রেখে কিছু লক্ষ্যভেদ করতে চায়, এমন ভঙ্গিতে এবং নিয়মমতো একটা চোখ বুজে বলল, 'আপনি মজহারচাচাকে চেনেন। খুব এলেমদার লোক। আপনার বাবার সঙ্গে খুব ভাব আছে। তো সেদিন কথায়-কথায় হঠাৎ আমাকে বললেন, আচ্ছা ইন্দ্র আমরা যা জানি, তাই তো জ্ঞান? খুব অদ্ভুত মানুষ এই মজহারচাচা।'

প্রজ্ঞা অস্থিরভাবে বলে উঠল, 'আপনি কি পাখিটাখি মারবেন?'

বন্দুক নামিয়ে ইন্দ্র বলল, 'নাঃ। মাছিটা ঠিক আছে কি না দেখছিলাম। এই বন্দুকটা নতুন। তো, যা বলছিলাম। আমরা যা জানি, তাই আমাদের জ্ঞান। দারুণ খাঁটি কথা না?'

'আপনি কী বলছেন, বুঝেছি।' প্রজ্ঞা আস্তে বলল। 'অন্নদামায়ের টাঁড় আমার জ্ঞান। তবে আপনার মজহারচাচাকে বলবেন, দু রকমের জ্ঞান আছে।'

ইন্দ্র তার দিকে তাকাল দৃষ্টিতে কৌতুক ছিল। বলল, 'আমি তত বেশি লেখাপড়া করিনি। জংলি আকাট মুখ্যু।'

'সেজন্যই আপনার সাহায্য চাইতে এসেছি।' প্রজ্ঞা গ্রাহ্য করল না এতে ইন্দ্র অপমানিত বোধ করবে কি না। সেই অস্থিরতাকে বাক্যে-বাক্যে মাখাতে থাকল সে। 'আমি শুনেছি আপনি বাঘ মেরেছিলেন। আমার কাছে এও একটা বাঘ।'

'অন্নদামায়ের টাঁড়?'

'অন্নদামায়ের টাঁড়।' প্রজ্ঞা ছটফট করছিল। 'বাঘ জঙ্গলে লুকিয়ে থাকে। আপনি যে বাঘটা মেরেছিলেন, সেটা কেমন ছিল জানি না। আমার জানা এই বাঘটা খুব সাংঘাতিক।'

ইন্দ্র মুখে ভাবনার ছাপ এনে বলল, 'কাছারির পুরনো লোকেদের কাছে খোঁজ নিতে হয়। মজহারচাচার না জানাই সম্ভব। বাইরের লোক। কাছারির কেউ না জানলে পরগনার বুড়ো-টুড়োরা কেউ···আচ্ছা, দেখছি।'

প্রজ্ঞা হালকা পায়ে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল। বাগিচার মধ্যে আবার হাজার বসন্ত ঝলমলিয়ে উঠল। বাগিচাটি এতদিনে উদ্দেশ্যপূর্ণ মনে হল ইন্দ্রের কাছে। কিন্তু এভাবেই আরেকটি রহস্য ইন্দ্রের পারিপার্শ্বিক আঁধারে আভাসিত হল। তার গা ছমছম করতে থাকল। একটু পরে সে বুঝল, এ এটা চ্যালেঞ্জ। অন্য এক বাঘের খবর।···

॥ ১ ॥

মজহারউদ্দিনের সঙ্গে দিনমণির সখ্যতার সূত্রে ছিল নিছক একটা কৌতূহল। দিনমণির চোখে পড়েছিল, প্রথমত মেয়েলি চুল ও দেখনসই গোঁফ। দ্বিতীয়ত ধুতি পাঞ্জাবি। সচরাচর ধুতি-পাঞ্জাবিপরা শুঁফো মুসলমানলোক প্রচুর দেখা যায়। কিন্তু মেয়েলি, অথবা বলা চলে, সন্নেসিচুলে নতুনত্ব ছিল। প্রথম আলাপে দিনমণিকে মজহারউদ্দিন খান চমৎকার বুঝিয়ে দেন, মুসলমান সুফি সাধকরা দীর্ঘকেশী। তবে তিনি সুফি নন, সাধকও নন। তাঁর খান পদবি থেকে মধ্য এশিয়ার তুর্কি কিংবা উত্তরপশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের পাঠান, দুই-ই দাবি করা চলে। কিন্তু বংশানুক্রম বিশ্বাসে তিনি পাঠানবাচ্চা।

'পাঠানবাচ্চা'-টা তিনি খুব রগড়ে বলেছিলেন। এই রগড় দিনমণির শুঁটকো কেঠো মূর্তিকে ঝাপটা মেরে ভিজিয়ে দেয়। দিনমণি দুর্লভ হেসে বলেন, বংশানুক্রম বিশ্বাসের কথা উঠলে তাঁরও একটি ঠা বর্তমান।

'কী সেটা'

'মারাঠা।'

পরে দিনমণিও বিশদ ব্যাখ্যা দেন, যা ঐতিহাসিক। নবাব আলিবর্দি, ভাস্কর পণ্ডিতের বর্গিহানা, চুটকিহিসেবে একটি গল্প, যাতে আহত এক মারাঠা বর্গির গোপনে বাঙালিবাড়ি আশ্রয়লাভ এবং আশ্রয়দাতার মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ইত্যাদি গতানুগতিক রোমান্স। দিনমণি শেষে বলেন, 'গল্প হতেও পারে, নাও হতে পারে। তবে একটা ব্যাপার লক্ষ করার মতো। আমি এমন কাউকে দেখিনি, যে বলে, আমরা বংশপরম্পরায় স্থানীয়। জিজ্ঞেস করুন, প্রত্যেকে বলবে, আমার ঊর্ধ্বতন পুরুষ বাইরে থেকে এসেছিল।'

'কথাটা ভাববার মতো।'

'হাতে-নাতে প্রমাণ দিচ্ছি'

দিনমণি লাঙ্গল কাঁধে এক চাষীকে ডেকে প্রশ্নটি তোলেন এবং চাষী লোকটি সত্যিই বলে, তার 'ওপর-পুরুষ' কোনও এক দফরপুর থেকে এসেছিল।

'তা হলে দেখলেন?'

মজহারউদ্দিন আবার বলেন, 'খুব ভাববার মতো কথা।'

দিনমণির ব্যাখ্যা ছিল, আসলে মানুষ ঠাঁই-নড়া এবং ব্যক্তিমাত্রেই যাযাবর-স্বভাবী প্রাণী, এ একটা কথা। আরেকটা কথা হল, পৃথিবীর কোনও মাটিকেই মানুষ আপন মাটি করতে পারে না। এ একটা ব্যর্থতা।

মজহারউদ্দিন রগড়ে বলেন, মুসলমানি শাস্ত্র কি খ্রিস্টান-ইহুদি শাস্ত্র অনুসারে প্রথম মানুষ-মানুষী স্বর্গ থেকে পৃথিবীতে নির্বাসিত হয়েছিল। সেটাও কারণ হতে পারে।

দিনমণি বলেন, হিন্দু শাস্ত্র মতেও ব্যাখ্যা করা চলে। সে ব্যাখ্যা এমন স্থূল নয়, সূক্ষ্ম। এ বিশ্বরজ্জুতে সর্পভ্রমবৎ। ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা। জড়জগত দূরের কথা, দেহ ও আত্মার সম্পর্ক মানুষ ও তার পোশাকের মতো। নশ্বরতার বোধ সহজাত এবং এই মাটি এই পৃথিবী নিছক মায়া, এই বোধও সহজাত মনে হয়। ফলে সবসময় মানুষের মনের ভেতর একটা ছটফটানি, যা থেকে নিজেকে বাইরের লোক সাব্যস্ত করার ঝোঁক। সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার ধরনটা একটু স্থূল হল। কিন্তু দিনমণি বুঝতে পেরেছেন, সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা যে, যেখানেই যান, সেখানকার কিছুই আপন মনে হয় না। পর থেকে যায়। প্রশ্নটা হল, তা হলে কোন ভূখণ্ড বা মাটি তাঁর আপন? এই খোঁজাতেই চুল পেকে গেল।

'আমারও'। মজহারউদ্দিন শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে উচ্চারণ করেন। পরে বলেন তিনি প্রত্যেক মাটিকে আপন করার জন্য খুব চেষ্টা সত্ত্বেও ব্যর্থ। বীরহাটা তাঁর কাছে সম্ভবত সর্বশেষ রণক্ষেত্র। বিশেষ কথা, ইচ্ছা আছে, জমিদারি সেরেস্ত এবং বাকি সবকিছু ছেড়ে পরগনার কোনও একটি বনেদি মুসলমান অধ্যুষিত গ্রামে একটি গানের আখড়া খুলবেন। মুসলমানরা তাঁকে হিন্দু ভাবে। সে কারণে সেও হবে দেখার যোগ্য লড়াই। আর, তিনি তো পাঠানবাচ্চাই। পাঠানর স্বভাবে জঙ্গি।

এই দার্শনিক আলোচনার কিছুদিন পরে দিনমণি আবিষ্কার করেন মজহারউদ্দিন সত্যিই ওস্তাদ গায়ক। তাঁর ঘরে তানপুরা আছে। মধ্যরাত পর্যন্ত গানের আসর বসে। বীরহাটার গায়ক-বাদ্যকর লোকেরা আসে। কাছাড়িবাড়ির

একটু তফাতে একটি খোড়ো ঘরে তাঁর বাসা। ঘরটি নিজের চেষ্টায় তৈরি। সাগরেদরাও সাহায্য করেছিল। তাদের মুখেই শোনেন, 'জমিদারশালা চাঁদু একটা গাড়ল। গাড়ল গান বোঝে না। খালি মদ আর মাগিবাজি। তবে ওর ছেলেটা ভাল। বাঘ মেরেছিল।'....

কাছারিবাড়ির পেছনে আগাছাপরিকীর্ণ ডাঙ্গা। তারপর নদীর বাঁধ। বাঁধে পাশাপাশি হাঁটতে হাঁটতে দার্শনিক আলোচনা হচ্ছিল দুজনে, রোজ বিকেলে যা হয়। হঠাৎ দিনমণি বললেন, 'গায়করা লম্বা চুল রাখেন কেন?'

মজহারউদ্দিন কৌতুকে বললেন, 'গোলাপফুল রঙ্গিন কেন?'

দিনমণি হাসলেন। 'উত্তর একটা হল বটে, তবে সদুত্তর নয়।'

'নয়। কারণ সব প্রশ্নের উত্তর হয় না।' মজহারউদ্দিনও খুব হাসলেন। 'যদি জানতে চাই, আপনি অমন খুঁটিয়ে চুল ছাঁটেন কেন, সদুত্তর পাব কি? কাশীশ্বরী স্কুলে আগের পণ্ডিতমশাইকে দেখেছি। তাঁরও আপনার মতো চুল ছিল। শুধু তফাত, তাঁর টিকি ছিল। আপনার নেই।'

দিনমণি আস্তে বললেন, 'সত্য গোপন করা নাকি পাপ।'

'হঠাৎ একথা কেন?'

'আমি জানি না কী পাপ, কী পুণ্য।' দিনমণি ঈষৎ আবেগে গাঢ়স্বরে বললেন। 'ভাই মজহারউদ্দিন, তোমাকে বিশ্বাস করি। কারণ আমরা পরস্পর খুব কাছাকাছি চলে এসেছি ক্রমশ। আমি ঈশ্বরবিশ্বাসহীন, নাস্তিক। আমি কপটতা করে বেঁচে আছি। বড় গ্লানি। কিন্তু...'

মজহারউদ্দিন এসব বাক্যের প্রতিটি শব্দ মনোযোগে শুনছিলেন। বাজিয়ে দেখছিলেন। তিনি গায়কহেতু ছন্দ-তাল-মাত্রা সম্যক বোঝেন। বললেন, 'কিন্তুটা কী?'

'আর আমার সহ্য হচ্ছে না।'

'কী?'

'এই কপটতা।' দিনমণি সখেদে বললেন। 'আমি এখানে আসতে চাইনি। বীরহাটার মাটি আমার অসহ্য। অথচ আসতে হল। আমার মেয়ে বড্ড গোঁয়ার। আমাকে আসতে বাধ্য করল।'

মজহারউদ্দিন পারিপার্শ্বিক জনহীন দেখে নিয়ে বললেন, 'খুলে বললে ভাল হয়।'

'তুমি তো এখানে অনেকদিন আছ। অন্নদামায়ের টাঁড়ের কথা শুনেছ?'

'না তো। কী সেটা ?'

দিনমণির ঠোঁটের কোণায় একটু বাঁকা হাসি ফুটে উঠল। 'হিন্দুমতে স্ত্রীকে স্বামী ত্যাগ করলেও সে সতী-ই থেকে যায়। আমি নাস্তিক। আমার বিচারবুদ্ধি ভিন্ন। আমার কাছে পরিত্যক্ত স্ত্রী পরনারী।'

তীক্ষ্ণবুদ্ধি মজহারউদ্দিন একটা কিছু আঁচ করে রগড়বাক্য আওড়ালেন, 'পরনারী মাতৃবৎ।'

'জানো দেখছি। তবে ওটা নীতিশাস্ত্রের বচন।'

'ওহে পণ্ডিত ! অন্নদা কি তোমার বিবি ছিলেন ?' মজহারউদ্দিন উচ্চহাস্য করলেন। তুমি ভাই নাস্তিক নও। মুসলমানের বাড়া। এজন্যই এখানে তোমার বদনাম জাতনাশা বামুন। তা হলে জানা গেল, যা রটে, কিছু কিছু বটে। তোমার মেয়ের মায়ের নাম অন্নদা' কী ?'

এ প্রশ্নের উত্তর দিলেন না দিনমণি। বললেন, 'অন্নদার ইচ্ছে ছিল আশ্রম খুলবে। তখন হারামজাদি কুলটা সাধিকা সেজেছে। সন্ন্যাসিনী ! বীরহাটায় চলে এসেছে। চন্দ্রনাথবাবুর বাবা হরনাথের ডাকে। একলপ্তে বাহান্ন বিঘে মাটি দিল হরনাথ। লম্পট শিরোমণি। মাগি সেই টাঁড় জমিতে···থাক সে সব কথা !'

কিছুক্ষণ পরে মজহারউদ্দিন বললেন, 'তোমার মেয়ের উদ্দেশ্য কী ?'

'জানি না।' অন্যমনস্ক দিনমণি বললেন। 'পারুর মধ্যে ওর মায়ের কিছুটা আছে। মুখ দেখে কিছু বোঝা যায় না। যে সব কথা বলে, তারও যেন আলাদা অর্থ থাকে।'

'যেমন ?'

মজহারউদ্দিন উদাহরণ দাবি করলে দিনমণি মৃদু স্বরে বললেন, 'বাহান্ন বিঘে মাটিটা খুঁজে বের করব বলেছে। এর একটা আলাদা অর্থ আছে। ভরা নদীর তলায় চোরা উল্টো স্রোত।'

'তুমি খোঁজ দাওনি তাকে ?'

'না। কারণ পারুকে নিয়ে আমার সমস্যা। অনেকরকম সমস্যা। নিজে-নিজে বেড়ে ওঠা মেয়ে। এই গাছগুলো দেখছ ? এরকম। এদের কোনওটাকে শায়েস্তা করতে হলে কোপ মারতে হয় ডালপালায় বা গোড়ায়। তা কি পারি, বলো তুমি ?'

'তোমার মেয়েকে প্রথম ভেবেছিলাম, কিছু মনে কোরোনা ভাই পণ্ডিত—ছিটগ্রস্ত ; কিঞ্চিৎ পাগলি।' মজহারউদ্দিন গম্ভীর থেকেই বললেন। 'আমাকে দেখলে এড়িয়ে যায়। অথচ আমার রাতের আসর বসলে কাছারিবাড়ির

পেছনে এসে দাঁড়িয়ে থাকে। গুনু বলছিল, সে দেখেছে।'

দিনমণি হাসবার চেষ্টা করে বললেন,' পারু-ই বলেছিল তুমি গাইয়ে ওস্তাদ।'

'আমার রাতের আসরের গান শুনতে কাছারিবাড়ির যত কর্মচারী আছেন, সকল বাড়ির মেয়েরা এসে শিরীষতলায় দাঁড়িয়ে থাকে।' মজহারউদ্দিন দাঁড়িয়ে পড়লেন। 'গুনু তাদের ভিড়েই তোমার মেয়েকে দেখেছে।'

তুমি ভাবছ, ওকে আমি শাসন করব একা এসেছিল ভেবে ? তাহলে তুমি ভুল করছ।'

'শাসন করা উচিত, যদি একা আসে।'

'আমি অক্ষম হে! পারু বেপরোয়া।'

'তোমার মেয়ের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।'

দিনমণি স্বাভাবিক হলেন এতক্ষণে। সুস্বাগত। তবে একটা শর্ত।'

'বলো, পণ্ডিত !'

'অন্নদামাগির টাঁড় কোথায় আমি জানি, এটা তাকে বলবে না।'

'বেশ। কিন্তু এখানকার লোকেরা নিশ্চয় জানে ?'

দিনমণি শ্বাস ফেলে বললেন, 'আবছাভাবে জানে। তেইশটা বছর কম কথা নয়। আর দেখ, এলাকার ভূপ্রকৃতির কত পরিবর্তন হয়েছে। এই বাঁধটা ছিল না, হয়েছে। জঙ্গল ক্ষেত হয়েছে, ক্ষেত হয়েছে জঙ্গল। এই নদী একটা বড় কারণ। নদীটা পথ বদলেছে। থাক, আর বলব না। চলো, ফেরা যাক।'...

ফেরার সময় বাঁধের নীচে একটুকরো সমতল জমিতে একজন মুসলমান চাষী বা ক্ষেতমজুরকে নামাজ পড়তে দেখে দিনমণি বললেন, 'দৃশ্য হিসেবে সুন্দর। নির্জনে সূর্যাস্তের সময় একা একজন মানুষ নিজেকে নত করছে। কিন্তু কথা হল, কার কাছে ? কেউ কি আছে কোথাও ? থাকে যদি, এ জগৎ এমন কদর্য কেন ? ওহে পাঠানবাচ্চা, তুমি নামাজ পড়ো না ?'

'কদাচিৎ মন কোনও কারণে খারাপ থাকলে, তবেই।' মজহারউদ্দিন একটু হাসলেন, নিঃশব্দ হাসি। 'তবে আমার গানই আমার প্রার্থনা। তুমি গাইয়ে হলে বুঝতে, গান আধ্যাত্মিক বোধ জাগায়। আমার বিবেচনায় সঙ্গীত আসলে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মূলাধার কোনও শক্তির কাছে আত্মসমর্পণ।'

'তুমি কতদূর লেখাপড়া শিখেছ ?'

'সামান্য। কেন ?'

'তুমি এমন সব দার্শনিক বুলি আওড়াও, অবাক লাগে।'

মজহারউদ্দিন দ্রুত দুই হাতে দুই কানের লতি ছুঁয়ে বললেন, 'ওস্তাদজির

দয়ায়।'

'আচ্ছা মজহার, তুমি এ কথা কি কখনও ভেবে দেখেছ, কোনও মানুষই নিজের ইচ্ছায় জন্মায় না ? একজন পুরুষ এবং একজন স্ত্রীলোকের কামপ্রবৃত্তিই তার জন্মের হেতু ! কাজেই...'

'থামো ! যে ভাবেই হোক, মনুষ্যজীবন তুমি পেয়েছ। এখন বাকি কাজ হল, সেটা সৎকাজে লাগানো। এখানেই তোমার নিজের দায়িত্ব এসে পড়ছে।'

'কী যে বলো ! আমার ইচ্ছা-অনিচ্ছা বা দায়িত্ব পালন কি স্বাধীন ? আরও অসংখ্য মানুষ, অসংখ্য ঘটনা আমার জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। চাইলেই আমি সৎ বা মহাপুরুষ হতে পারি না। পারি কি ?'

একটু ভেবে মজহারউদ্দিন বললেন, 'কেউ-কেউ পারে বৈকি। সেজন্য লড়াই করতে হয়।'

'ছেঁদো কথা। সবই ঘটনাচক্রের পরিণাম।' একটু পরে ফের বললেন, 'অবশ্য তুমি পাঠানবাচ্চা। জঙ্গি।'

তেতোমুখে কথাটা বলে দিনমণি থুথু ফেলতে মুখ ঘোরালেন নদীর দিকে। নদীটি মাঝারি। সোনালি বালিতে আঁটাসোঁটো দেখাচ্ছিল। একপ্রান্তে কোঁকড়ানো জলস্রোত, এখনই সেই জল রাতের ছায়া গায়ে নিয়েছে। বালির চড়ায় স্থির, নিঃশব্দ একটি অশ্বচিত্র। তারপর চোখে পড়ল, ছায়াধূসর ঝিরঝিরে জলে পা ডুবিয়ে দাঁড়িয়ে আছে তাঁরই কন্যা। সেও স্থির একটি ভাস্কর্যমাত্র।

আর ঢালু পাড়ের শীর্ষে নিচু, মোটামোটা ঝাঁকড়া একটি গাছের পাশে বন্দুক হাতে কেউ দাঁড়িয়ে আছে। অবশ্যই ইন্দ্র সে। পরনে যোধপুরী ব্রিচেস। মাথায় হ্যাট। শিকারী মূর্তিটি আরও এক ভাস্কর্য বোধ হল।

মুহূর্তকাল পরে সংযত হলেন দিনমণি শাস্ত্রী। মজহারউদ্দিনের দৃষ্টি বিপরীত দিকে। গুনগুন করে পুরিয়া ভাঁজছেন। দিনমণি নীচের ন্যাড়া আবাদি জমিতে নেমে গেলেন। তখন গায়ক তাঁর অনুগামী হয়ে বললেন, 'উড়ছ কেন হে পণ্ডিত ? নাকি টাট্টি পেয়েছে ? তা হলে উল্টোদিকে কেন ?'

দিনমণি বললেন, 'একটা জরুরি কাজ ছিল বাজারে। ভুলে গিয়েছিলাম। একটু পা চালিয়ে এস।'...

'চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত'-জনিত জমিদারি স্বর্ণযুগে যোধপুরী ব্রিচেস, বন্দুক, হ্যাট, ঘোড়া ভূমিচিত্রে ছিল মানানসই সমাবেশ। তার ওপর বিলিতি কেতা। বীরহাটার পিচ-রাস্তার মালিক জেলাবোর্ড, চন্দ্রনাথ যার সদস্য। তাঁর একটি অস্টিন মোটরগাড়িও ছিল। লোকে বলত হাওয়াগাড়ি। ততদিনে বাইসাইকেলের

প্রচলন হয়েছে। লোকে বলে, টিপগাড়ি। টর্চকে বলে চিরিকবাতি। জমিদারবাড়িটির স্থাপত্যশৈলী হযবরল। তবে কাশীশ্বরী হাই ইংলিশ স্কুলের দালানটি সামনের দিকে ইতালীয় স্থাপত্যের অনুকরণ। থাম এবং শীর্ষে ত্রিকোণ কাঠামো। আবার বোর্ডিং ঘরগুলি মাটির দেয়াল, খড়ের চাল। বলা হত আঠারোপাড়া গ্রাম, কিন্তু প্রকৃতিতে যথার্থ একটি গঞ্জ। ঘোড়ার গাড়ি, গরু-মোষের গাড়ি, বাসমোটর, মানুষজনের ভিড়। দিনমানে মার মার কাটকাট হল্লা। নদীতে তখনও ব্রিজ হয়নি। বর্ষায় নৌকোয় গাড়ি পারাপার হয়। বাঁধ শক্তিশালী হওয়ার পর বীরহাটাও শক্তিশালী হয়। এদিকে ঘোর শাক্ত জমিদারবাড়িতে কালীপুজোয় মোষবলিও উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ধুমধামটি কালীপুজোরই বেশি। উত্তর-পশ্চিম রাঢ়ে শৈব-শাক্ত এক। যে শৈব, সে-ই শাক্ত। মুসলমানপাড়াটির চৈতন্যে, অত্যন্ত গোপনে, শৈব-শাক্ত উভয় প্রভাবই ছিল। কালীপুজোর রাতে মুসলমান পুরুষ-স্ত্রীলোক কেউ কেউ তন্ত্র-ঠিকন-ঠাকন বশীকরণ-মারণ-উচাটন এ সব গুপ্ত কাজে লিপ্ত হত। মসজিদটি দর্শনধারী। কিন্তু জুম্মাবার শুক্রবার ছাড়া খাঁ খাঁ জনহীন। মাইনেকরা মৌলবিসায়েব জুম্মাবারটিতে সম্প্রদায়কে বাগে পেতেন এবং তর্জনগর্জনে দুনিয়ার আগুনের চেয়ে আশি হাজার গুণ তেজী দোজখের আগুনের কথা বলে শাসাতেন। মুসলমান হলে চুপচাপ এসব কথা শুনতে হয়। তারা শুনত। কিন্তু মেয়েরা বেপর্দা হয়ে মাঠে যায়, ছাগল চরায়, বাজারে আনাজ বেচতে যায়। বীরহাটায় সব পুরুষই বীরত্বপ্রবণ, সব স্ত্রীলোকই বীরাঙ্গনা-স্বভাবী। তবে জমিদারবাবু বলতেই ভব্যতাহেতু মুখে ভক্তিভাব, তিনিই মা-বাপ।

আবার আড়ালে 'চাঁদুশালা লম্পট মাগিবাজ মাতাল' বলত একই মুখে। এই বৈপরীত্য অবশ্য মানুষদের বিশ্বজনীন চরিত্র। কিন্তু বীরহাটায় এটি ছিল চূড়ান্তরকমের। আঠারোটি পাড়া সত্যিই আছে কি না কেউ গুণে দেখেনি। তবে পাড়াগুলির মধ্যে কিছু পাড়ার গ্রাম স্বভাবত জাতি-বৃত্তিভিত্তিক। বাকিগুলির অর্থভেদ দুঃসাধ্য। ঘাঁটারিপাড়া, কড়ে পাড়া, টিকলিপাড়া। আবার 'পাড়া' শব্দবর্জিত পাড়া 'সর্ষেমাঠ', 'হোরোব্বাড়ি', এগুলি থাকবন্দি ছিল আনাচেকানাচে। দাপুটে পাড়া বলতে অবশ্যই বাবুপাড়া। এই পাড়াটি মন্দির-কণ্টকিত। কাঁটার উপমা প্রয়োগের কারণ বীরহাটার সর্বোচ্চ তালগাছের ডগা থেকে তাড়ির হাঁড়ি নামানোর পর রমনা নামক এক মাতাল বলেছিল, 'বাবুরা বড়ই কাঁটা হে! ওপর থেকে তাকাই আর ভাবি, দেবতার ঘর, তাকেও কাঁটা করেছে। খোঁচাচ্ছে দেবতার ঘর দিয়ে।' সে মন্দিরগুলির সূঁচলো চুড়োর

এরকম বর্ণনা দিয়েছিল। কত মন্দির! জীর্ণ, ক্ষয়াটে, বিষণ্ণ ও রাগী চেহারার অজস্র মন্দির। ভেতরে শিবলিঙ্গ। কোনওটি পুজো পায়, কোনওটি পায় না। কিন্তু এখানেও মাটিসংক্রান্ত গাঢ় রহস্য আছে। প্রতি মন্দিরের সঙ্গে কম-বেশি দেবোত্তর ভূসম্পত্তি আবদ্ধ এবং শরিকি মামলায় আদালতগুলির সঙ্গে কর্মসূত্রে জড়িত লোকসকলের প্রভূত সমৃদ্ধি ঘটত। হাশিম মির পেশকার দেখতে দেখতে বড়লোক হয়ে ওঠেন। ছুটিছাটায় গ্রামের বাড়িতে এলে তাঁর কী সমাদর! মামলায় জেরবার বাবুরা একে অন্যের অগোচরে পেশকারসায়েবের দর্শনার্থী হন। বীরহাটার মুসলমানদের এইটিই একমাত্র অহঙ্কার ছিল। আবার একমাত্র আতঙ্কও ছিল। পবিত্র কোরাণে আল্লাহ্ বলেছেন, তিনি মানুষকে কলমের সাহায্যে জ্ঞান দান করেন। তাই আরবি শব্দে 'কলম' মুসলমান চৈতন্যে জ্ঞানের প্রতীক। অথচ মাটির দুনিয়ায় সেই কলমের কী বেইজ্জতি! কলমবাজ পেশকার লোকটির প্রতি ভক্তি ভয় দুই-ই ছিল এভাবে। বুড়ো মুসলমান লোকেরা বংশধরদের শাসাত, ইস্কুলে গেলেই কলমবাজ হবে, আর কলমবাজ হলেই মামলাবাজ হবে। সমান আর্থ-সামাজিক অবস্থানের হিন্দুরাও একই কথা বলত। এই মানসিকতাই বাবুআধিপত্যের বড় ঐতিহাসিক কারণ। কর্ণওয়ালিশি ব্যবস্থা জমিদারির স্বর্ণযুগে সাধারণ লক্ষণ মাটির মামলা। আর মামলা মানে প্রকারান্তরে 'কলম'-এর লড়াই। হাকিমের হাতে কলম উঠলে আদালতে বাদী-বিবাদীর রক্তে শিহরণ ঘটত। মাটি যাওয়া মানে বুকের পাঁজর উপড়ে যাওয়া।...

'কিছু বোঝা যায় না।' সেই সন্ধ্যায় দিনমণি ঘরে ফিরতে ইচ্ছাকৃত দেরি করেন এবং মজহারউদ্দিনের ঘরের বারান্দায় কম্বলে বসেন। বীরহাটা সম্পর্কে মজহারউদ্দিনের নিজের ধারণা বর্ণনা করে কথাটি বলেন। 'বেশি লোকের বসতিতে দুনিয়াদারির একরকম চেহারা মালুম হয়। কম লোকের বসতিতে অন্যরকম। তুমি বলছিলে, সব মাটিতে সব লোক নিজেদের বাইরের লোক বলে প্রচার করে। কিন্তু তা হলে মাটি নিয়ে এত মাথা ফাটাফাটি কেন?'

দিনমণির আসল মন নদীতে পড়ে আছে তখনও। ওপরকার অন্য মন থেকে বললেন, 'তুমি কি মহাভারতের গল্পটা জানো?'

মজহারউদ্দিন চারকোণা সুদৃশ্য চীনা লণ্ঠনটি শলাইকাঠি জ্বেলে ধরাচ্ছিলেন। বললেন, 'মুসলমান হয়ে জন্মানোর বাড়তি সুবিধে আছে। তোমরা শুধু নিজের ধর্মটা জানো। আমরা নিজেরটা আর তোমাদেরটা দুটোই জানি। তবে

কুরুক্ষেত্রের লড়াইয়ে মাটিটা বোধ করি উপলক্ষ। মূল কাজিয়া স্ত্রীলোক নিয়ে।'

'তুমি কি দ্রৌপদীর কথা বলছ?'

'আবার কার? দুর্যোধনের আঁতে ঘা লেগেছিল। চোখের সামনে দ্রৌপদীকে জিতে নিল।' মজহারউদ্দিন শিশুহাসি হাসলেন। 'স্ত্রীলোক বড় হ্যাপা। আমাদের শাস্ত্রে আছে, আদম হাওয়াবিবির কথায় গন্দমগাছের ফল খেয়েছিল। তারপর জ্ঞান হল, তাই তো! আমি ন্যাংটা। ছি ছি! ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে রইল। লজ্জা হয়েছিল।'

'তুমি কি কখনও বিয়ে করোনি?'

'আমাদের ধর্মে বেম্মচারি থাকা গোনাহ্। কিন্তু কী করি? বললাম না স্ত্রীলোকের বড় হ্যাপা? নিজের কিছুই সাজিয়েগুছিয়ে রাখতে পারি না তো অন্যের! সে কাজটা তো সেরেস্তার চাকরি নয়।'

ঘর বা বাড়িটির সামনে সবটাই পোড়ো জমি। বারান্দার নীচে খানিকটা জায়গা লোকের পায়ে-পায়ে ঘাস উঠে ন্যাড়া এবং শাদা হয়ে আছে। সেখানে একটি ছায়ামূর্তি দেখা গেল। মজহারউদ্দিন বললেন, 'গুনু! আমার বরাত দ্যাখ, বাপ, কে এসেছে।'

গুনু নাপিতবাড়ির ছেলে। ভাল তবলচি। দ্রুত এসে দিনমণির পায়ের ধুলো নিল। 'পণ্ডিতমশাইকে দূর থেকে দেখি আর ভাবি, গানবাজনার বড় বিদ্যা। নৈলে ওস্তাদজির সঙ্গে ভাবের মানে হয় না। অথচ আসরে কখনও দেখি না। আজ আমারও বাপের ভাগ্যি।'

দিনমণি চুপ। মজহারউদ্দিন বললেন, 'তুই ব্যাটা গাড়ল। কী করে ভাবলি---শালা! পণ্ডিত লোক তোর ওই ধেরেকেটে মেরেকেটে শুনতে আসবে! এক কাজ কর দিকি। গয়লার পো এখনও আসতে দেরি করছে কেন দেখে আয়। আর শোন বাপ। চাটুজ্জেকে খবর দিয়ে আসবি। যন্তরহাতে যেন আসেন। আজ রাতে বাকবাদিনী চক্কর মারছেন মাথার ওপরে। পা ধরে টেনে নামাব।'

গুনু চলে গেলে দিনমণি বললেন, 'তুমিও দেখছি শালা-টালা মুখখারাপ করো!'

'করি। চড়চাঁটিও মারি, বামুন-শুদ্দুর মানি না। আমি তোমার মতো এক মাস্টারলোক হে!'

'তোমাকে দেখলে রামপ্রসাদের কথা মনে পড়ে যায়!'

অমনি মজহারউদ্দিন গুনগুনিয়ে উঠলেন, 'আমায় দে মা তবিলদারি।'

'বাঃ ! সবরকমই জানো দেখছি।'

'জানি। তবে সব গান গান নয়, যেমন সব গাছ গাছ নয়। আগাছাও থাকে। আমি বটগাছ সার করেছি হে ! বাকি সব ফালতু।'

'উঠি।'

কাছারিবাড়ির গেটে দারোয়ানের কেতা আছে। দিনমণির আগম-নির্গমে করযোড়ে প্রণাম প্রাপ্য হয়। গ্রাহ্য করেন না। দারোয়ানদ্বয়ের একজন গোর্খা অন্যজন ভোজপুরী। দুধারে চকবন্দি একতলা দালান, টানা বারান্দা। সামনে দোতলা প্রাসাদ। সোপানের দুধারে সামন্ত ঐতিহ্য প্রতীক দুটি তোপ। লোকে বলে, জাল তোপ। নেহাত দেখনশোভা। কিন্তু দিনমণি স্কুলে শুনেছেন, তোপদুটি নদীর ওধারে কোন জঙ্গলে পড়ে ছিল। কুড়িয়ে আনা হয়েছিল। চকবন্দি দালানের শেষাংশে প্রাঙ্গণের দুধারেই বারান্দায় ইট বা ছাঁচবাতার বেড়া। ওই ঘরগুলি কর্মচারীদের পারিবারিক বাসস্থান। ফলে নীচের কিছু চৌকো অংশও বেড়ায় ঘেরা। ফুল ও মরশুমি সবজির বাগিচা আছে। কেউ-কেউ গাইগোরুও পোষেন। দিনমণির বাসস্থানটি বাঁদিকে উত্তরপূর্ব কোণে শেষ ঘর। আব্রুহীন। শুধু বারান্দার একাংশে ছাঁচবাতাঘেরা রান্নাঘর, যেমন তেমন একটু আড়াল মাত্র।

বারান্দায় লণ্ঠন দেখে বুঝলেন প্রজ্ঞা ফিরেছে। মধ্যবর্তী প্রাঙ্গণের বুক চিরে অস্টিন গাড়ি বা ঘোড়ার টমটম যাতায়াতের শানবাঁধানো পথ, হাত দশেক চওড়া। দুধারে পামগাছের সার। একটার আড়ালে একটু দাঁড়ালেন দিনমণি। রোজ সন্ধ্যায় স্থানটিকে এমন নির্জীব আর উদ্দেশ্যহীন মনে হয়, তার কারণ বুঝতে পেরেছেন ক্রমশ। সেটা হল দিনমান লোকজন, গাড়িঘোড়াপালকির ভিড, যা বাজারের হল্লা সৃষ্টি করে। জমিদারি সদর কাছারি মানে আপিস-আদালত দুই-ই। গুজব, খাজাঞ্চিখানার ভেতরদিকে পাতালে হাজতঘরও আছে। দিনমণির খোঁজার স্পৃহা নেই। কৌতূহলও নেই কোনও ব্যাপারে। আজ আকস্মিক কৌতূহল নিজের কন্যার প্রতি, শিকারি প্রাণী যেভাবে আড়াল থেকে শিকারকে লক্ষ্য করে, সেইভাবে দাঁড়িয়ে গেছেন।

নাকি ইন্দ্রকে দেখবেন ভেবেছিলেন ? কোনও গতিবিধি নেই। বারান্দাটুকুতে লণ্ঠনটি শান্ত জ্বলছে। এই সন্ধ্যায় হাওয়া বড় ঝাঁপালো। পামপাতায় খড়খড় খসখস শব্দ। কাছারিবাড়ির দক্ষিণে জোটবদ্ধ উঁচু আঁধার গাছপালায় শনশনানি। একশো মুখে কথা বলছে প্রকৃতি সিদ্ধান্ত নিয়ে এগিয়ে গেলেন দিনমণি।

বারান্দায় উঠেই থমকে দাঁড়ালেন। ঘরের ভেতর তক্তাপোশে লম্প জ্বলছে।

লম্পের আলোয় বিছানো একটা নোংরা, বেরঙা, জীর্ণ জরিপের নকশার দিকে ঝুঁকে বসেছে প্রজ্ঞা। পাশের ভাঁজকরা কাগজগুলো পুরনো রেকর্ড-পরচা-দলিল লাল সুতোয় বাঁধা। সে মুখ তুলে বাইরে বাবাকে দেখে নামিয়ে নিল। আস্তে বলল, 'ঠিক বুঝতে পারছি না। দেখ তো, তুমি এসব বুঝবে।'

নিমেষে সিদ্ধান্তটি বদলে গেল দিনমণির। কী করতে যাচ্ছিলেন! একটু সরে সাবধানে হাতের টুকরো ইটটি ছুড়ে ফেললেন। চোখ ফেটে জল এল। কাঁপছিলেন। একটু পরে ভাঙ্গা গলায় বললেন, 'কোথায় পেলি?'

প্রজ্ঞা আবার মুখ তুলল। 'তোমার শরীর খারাপ করছে নাকি?'

'নাঃ!' সশব্দে নাক ঝেড়ে দিনমণি বললেন। 'হঠাৎ একটু সর্দিমতো।'

'দেখে যাও!'

দিনমণি দেরি করে ঘরে ঢুকলেন। তত্কাপোশে একটু তফাতে বসে শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বললেন ফের, 'এসব কোথায় পেলি?'

প্রজ্ঞা একটু হাসল। 'ইন্দ্রবাবু কাছারির সিন্দুক হাতড়ে বের করেছেন।'

'ওকে কী বলেছিলি তুই?'

'অন্নদামায়ের টাঁড়ের কথা। আর কিছু না।' প্রজ্ঞার হাতে কাঠপেন্সিল। নকশার একটা জায়গা দেখিয়ে বলল, 'এই একটা লম্বা চৌকো প্লট। কিন্তু গিয়ে দেখি, কিছু মিলছে না। দেখাচ্ছি!' সে ফিতে তুলে ভাঁজকরা একটা কাগজ খুলল। 'এই দেখ, পড়চায় লেখা শ্রীমতী অন্নদারানী দেব্যা। আর এইটে দলিল। দানপত্র।'

দিনমণি কিছু দেখলেন না। 'হুঁ—তারপর?'

'তুমি অমন করে কথা বলছ কেন? আমার মায়ের জমি।' সে আরেকটা দলিল খুলল।' এই দেখ মায়ের উইল। আমার নাম লেখা আছে, দেখ।'

দিনমণি দেখলেনই না। তেমনি বললেন—'হুঁ—তারপর?'

প্রজ্ঞা একটু পরে বলল, 'তুমি স্কুলে ছিলে দুপুরে। ইন্দ্রবাবু নিয়ে গেলেন।'

'ঘোড়ায়?'

'উনি ঘোড়ায়, আমি হেঁটে।'

'হুঁ—তারপর?' দিনমণির কণ্ঠস্বরে এবার ঈষৎ কোমলতা ছিল।

'এই দেখ নদী। নদীর বাঁকের মুখে এই দেখ চৌকো প্লট। কিন্তু গিয়ে দেখি, নদীর মজা খাত আর ঘন জঙ্গল। ইন্দ্রবাবু বললেন, জঙ্গলটাই হতে পারে। কারণ মাটিটা উঁচু। বানের পলি জমে ...ও! তোমাকে বলাই হয়নি, এখানকার লোকে বলে, বড়বানের বছর। বীরহাটাও ডুবেছিল সেবার।'

'জঙ্গলে ঢুকেছিলি ?'

প্রজ্ঞা কিছুক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর হঠাৎ আবেগে ছটফটিয়ে বলল, 'মায়ের নিঃশ্বাসের গন্ধ পেলাম বাবা ! মা আমার সঙ্গে একভাষায় কথা বলল। কী বলল, সব বুঝলাম, স—ব !'

প্রজ্ঞা নিঃশব্দে কাঁদতে থাকল। দিনমণি তবু বললেন, 'হুঁ—তারপর ?'

কান্না থামিয়ে শাড়ির আঁচলে চোখ মুছে প্রজ্ঞা কাগজপত্তর গুটিয়ে একটা ন্যাকড়ায় পরিপাটি করে বাঁধল। তারপর তক্তাপোশের তলা থেকে বেতের প্যাঁটরা বের করে সেটার ভেতর ঢোকাল। উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলল যখন, তখন সে আত্মস্থ ও স্বাভাবিক। মুখে ঈষৎ বালিকার হাসি, হাসিটি ভিজে ছিল। 'গাছগুলো খুব উঁচু, বাবা !...''

তার আরণ্যক খুব কান করে শুনছিলেন দিনমণি।...

॥ ২ ॥

কোনও ভূ-প্রকৃতির নিজস্ব কিছু জিনিস থাকে। জরিপের নকশা বা ভৌগোলিক মানচিত্রে তা খুঁজতে যাওয়া কোনও বিদ্যালয়ের হিসাবখাতায় বিদ্যালয় জিনিসটা খোঁজার মতো ব্যর্থ চেষ্টা মাত্র। মজহারউদ্দিন পণ্ডিত বন্ধুকে এই সকল কথা বোঝাতেন। সেরেস্তার কাগজে জমিদারবাবুকে ঢুঁড়ে মিলবে না। জমিদারি জিনিসটা কী, তাও সত্যিই কি আঁচ করা যাবে ? চৌধুরিরা কোন পুরুষে যখন 'রায়রায়ান' ছিলেন, তখন কুলখাড়ি মহালের চাষীদের সঙ্গে একটা হাঙ্গামা বেধেছিল। জমিদার প্রজার মা-বাপ। খাজনা তাঁর হক। কারণ মাটির মালিক তিনিই। কিন্তু মাটি কেউ চিবিয়ে খেয়ে খিদে মেটাবে বলে নেয়নি। চাষীর সঙ্গে মাটির সম্পর্ক মাগ-মরদের। মাগ বিয়োবে কি না ? তার চেয়ে বড় কথা, স্ত্রীলোকের সতীত্ব আর ভূমিস্বত্ব চাষীর কাছে একই জিনিসের দুই পিঠ।

কিন্তু ঘটনাটা কী ? দিনমণির এই কৌতূহলে মজহারউদ্দিন বলেন, গল্প শুনতেই চায় সবাই। গল্প একটা আছে। দিনমণি যাকে ঘটনা বলছেন, সেটাই গল্প। কুলখাড়ির এক বুড়ো চাষী এখনও গোমস্তাকে খাজনা দেয় না। লাঠি ঠুক ঠুক করে কাছারিবাড়ি এসে খাজাঞ্চিখানায় সরাসরি জমা দাখিল করে। সে কথায় কথায় মজহারউদ্দিনকে বলেছিল, জঙ্গলের সকল জানোয়ার শিকারে বেরুনোর মুখে আল্লাহকে বলে, দোহাই হুজুর, যেন 'দুপেয়ের' সামনে পড়ি না। এই দু' পেয়ে' বলতে মানুষ। বুড়ো নিজে মানুষ হয়েও মানুষকে বিশ্বাস করে

না। গোমস্তা তার কাছে মানুষ। কিন্তু খাজাঞ্চিখানা প্রতিষ্ঠান।

কথাটা কী? এবার মজহারউদ্দিন বলেন, লোকটা বলেছিল, কে-একজন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে ছিল। হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, ওই একটা মাথালি ভেসে যাচ্ছে। সে ঝাঁপ দেয় আর কী! তখন আরেকজন তাকে টেনে থামিয়ে বলল, ওরে বোকা! মাথালির তলায় মানুষ আছে। তার মানে, মাথালি মাথায় একটা লোক সাঁতার দিয়ে নদী পেরুচ্ছিল।

সেটাই আসল কথা। মাথালি ভেসে যাওয়াটা গপ্প, তলার মানুষটাই সত্য। গপ্পের গোরু গাছে চড়ে। কিন্তু গোরু আর গাছ সত্য। চড়া ব্যাপারটাও সত্য। কিন্তু এই তিনটে সত্যের জোড়তাপ্পি দিলে গপ্প তৈরি হয়। কুলখাড়ির চাষারা পঞ্চগ্রামী করে নিজেদের চেষ্টায় বাঁধ তৈরি করল। বলল, বেশি নয়, তিন সাল খাজনা মকুব হোক, এই আর্জি। রায়রায়ান পাইক পাঠালেন। দাঙ্গা হল। সেকালে এগুলিই যুদ্ধ, যত ছোটখাটো হোক। যুদ্ধের সঙ্গে লুঠের প্রগাঢ় সম্পর্ক আছে। স্রেফ লুঠের ভাগ পেতেই লোকেরা সেপাই-পাইক হত। চেঙ্গিস খান থেকে লর্ড ক্লাইভ থেকে সেই 'রায়রায়ান' পর্যন্ত এটাই রীতিনীতি ছিল। এখনও প্রকারান্তরে তাই। তবে ইংরেজ চালাক। আইনের পাতায় তাকে সভ্য চেহারা দিয়েছে। ছাপাখানার যুগে এই একটা বড় সুবিধে।

বক্তব্যটা কী?

মজহারউদ্দিন বলতেন, 'তোমার মেয়ে তার মায়ের মাটি খুঁজে বের করেছে বলছিলে। এখন নাকি জঙ্গল। তুমি দেখতে যাচ্ছ না বা দেখতে চাও না। কারণ দেখ পণ্ডিত, এইখানে তোমাদের বাপে-মেয়েতে খুব মিল। তোমরা দুজনেই জরিপের নকশা বা ভূগোলের মানচিত্র ছেড়ে নাকি জঙ্গলে তোমার বিবির গন্ধ পাও। সেখানে-কথাবার্তা শোনা যায়। ভেতরকার জিনিস দেখতে চেষ্টা করছ। এটাই গপ্প তৈরির চেষ্টা। কিংবা গপ্পটা তৈরিও হয়ে গেছে। বেশি কী আর বলব? ভেসে যাওয়া মাথালির তলায় মানুষ আছে। মেয়েকে সমঝে দিও।'

মেয়েকে সমঝাতে হলে সেই সন্ধ্যার মতো হাতে ইট নিতে হয়। এই কথাটা মনে পড়া মাত্র দিনমণির চোখ ফেটে জল আসে। রুগ্ন বোধ করেন। বুকের ভেতর থেকে ধড়াস শব্দে কী একটা খসে যায়। 'খুব উঁচু-উঁচু গাছ' বলেছিল প্রজ্ঞা। উঁচু জোটবদ্ধ সবুজ গাছগুলি কল্পনা করেন। এক অন্নদা অসংখ্য অন্নদা হয়ে জন্মেছে—মানুষের এমন জন্মান্তর হিন্দুশাস্ত্রে নেই। গাছের বন্দনা আছে, কিন্তু দেবদেবীর বাসস্থান হিসেবে। কখনও বা স্বয়ং দেবদেবীই। অরণ্যানী নামে এক দেবীও ছিলেন। কিন্তু অন্নদা মানুষী। তার আত্মা মানুষের, মেয়েমানুষের।

লোকে বলত খানকির টাঁড়। বর্ষার রাতে খানকির টাঁড়ে এসে প্রজ্ঞাকে চুরি করে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইটের একতলা নতুন বাড়ি, নতুন মন্দির—তবু অন্নদার লোক-নাম ছিল খানকি। অন্নদা কি তা জানত ? মতিহারি থেকে হরনাথের সঙ্গে পালকি চেপে চলে আসার দিন দিনমণি ছিলেন মথুরায়, সঙ্গে একদঙ্গল পুণ্যার্থী তীর্থযাত্রী। পুরনো কথা চাপা থাক। ভাবলেই কষ্ট।...

সেদিন সকাল থেকে আকাশ মেঘলা। বৃষ্টিমেঘ নয়, চৈত্রের অকারণ মেঘ। দুধের সর-জমে ওঠা সারা আকাশ জুড়ে, কতরকম নকশা ও ভাঁজ। 'পারু, আজও কি যাবি ?' দিনমণি করুণ প্রশ্ন করলেন।

প্রজ্ঞা বারান্দায় ভাত রাঁধছিল। বাবা খেয়েদেয়ে স্কুলে যাবেন। বলল, 'কেন ?'

'লোকের মুখ। কথা রটলে আমারই মাথা হেঁট হয়।'

'কে লোকের ধার ধারে ? বয়ে গেল।'

'আমি তোর বাবা।'

প্রজ্ঞা ফেন গলাতে দেওয়া পর্যন্ত চুপ করে থাকল। তারপর উঠে এসে দরজার চৌকাঠে হেলান দিল। ভাঙা খোঁপা ঠিকঠাক করতে করতে বলল, 'অন্নদারাণী দেব্যাও আমার মা। মায়ের কাছে মেয়ে গেলে তোমার মাথা হেঁট হবে কেন, বুঝিয়ে দাও।'

দিনমণি হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'প্রথম কথা, ভদ্রলোকের মেয়েরা মাঠেজঙ্গলে যায় না। যেতে দেখেনি কেউ। তাই চোখে পড়ে। দ্বিতীয়ত এই জমিদারবংশের দুর্নাম আছে। তৃতীয়ত পণ্ডিতমশাইয়ের মেয়ে অনাত্মীয় যুবকের সঙ্গে....'

প্রজ্ঞা কথার ওপর কথা ফেলল, 'তুমি তোমার মেয়েকে চেনো না ? বিশ্বাস করো না ?'

'আহা, আমার নিজের কথা বলছি না। লোকের কথা।'

'বয়ে গেল।'

দিনমণি চুপচাপ দেখে কিছুক্ষণ পরে প্রজ্ঞা আস্তে বলল, 'আমার মা সন্ন্যাসিনী হয়েছিল। ইন্দ্রবাবুর ঠাকুর্দা মাকে আশ্রমের জন্য জমি দিয়েছিলেন। জমিটাকে লোকে বলত, অন্নদামায়ের টাঁড়। আমি সেই সব কাগজ যোগাড় করেছি। জমিটার অনেকখানি নদী খেয়েছে। বাকি যা আছে, তাও কম নয়। ইন্দ্রবাবু বলছিলেন, চল্লিশ বিঘেটিঘে হবে। শুধু গাছগুলো যদি বেচি, হাজার টাকা দাম হয়। তারপর চাষবাস করলে...তুমি এদিকটা ভাবো।'

দিনমণি অন্যমনস্কভাবে বললেন, 'আমি বুঝতে পারছি না।'

'না বোঝার কী আছে?'

'আছে।' দিনমণি তীক্ষ্ণদৃষ্টে তাকালেন মেয়ের মুখের দিকে। 'তুই মাটির দিকে মন দিলি কেন? তোকে লেখাপড়া শিখতে দিয়েছিলাম। সেটা আমার একটা জেদ। কারণ তোর নাম রেখেছিলাম প্রজ্ঞাপারমিতা। আমরা পড়িয়ে বংশ। শাস্ত্রী। মাটি আমাদের কাছে স্থূল জড়পদার্থ।'

প্রজ্ঞা বাঁকা হাসি হাসল। 'তুমিই পড়াতে অন্ন ব্রহ্ম। আর ওই দেখ অন্ন। ফেন গলাতে দিয়েছি। খেয়ে ছাত্রদের ব্রহ্মজ্ঞান দিতে যাবে। অন্নের জন্ম মাটিতে। মাটিই অন্নদা। আমার মা।'

দিনমণি বিস্ময়ে তাকিয়ে রইলেন মেয়ের দিকে।

'মাকে তুমি সন্ন্যাসিনী ভেবেছিলে। মায়ের তুমি কিছুই বোঝেনি। বাবা! আমি ওখানকার লোকের কাছে শুনে এসেছি, মা টাঁড় জমিতে চাষীদের পত্তনি দিতে চেয়েছিল। আলসের ধাড়ি সব। বলেছিল, নদী থেকে জল টানতে মারা পড়বে।' প্রজ্ঞা হাসতে লাগল। হাসিতে আবেগ ছিল। 'মা নিজের হাতে গাছ পুঁতে দেখিয়ে দিয়েছিল। সেই সব গাছ দেখতে দেখতে জঙ্গল হয়ে গেল। বড় বানের বছর পলি পড়ল। গাছ আরও উঁচু হল। মা দেখে যেতে পেল না।' হাসির চাপে তার চোখে জল এসে গেল।

একটু দ্বিধার পর দিনমণি বললেন, 'তোকে সব কথা বলিনি। বলার যোগ্য নয়। তোর মা....'

ঘুরে দাঁড়িয়ে প্রজ্ঞা ফুঁসে উঠল। 'শুনব না।'

'তুই তা হলে শুনেছিস কারও কাছে।'

'না। কেউ কিছু বললেও শুনব না।'

'অবুঝ!'

'হ্যাঁ, আমি অবুঝ।' প্রজ্ঞা অস্থির হয়ে বলল। ' যতদিন ওখানে পা ফেলিনি, ততদিন ওটা ছিল কথার কথা। অন্নদামায়ের টাঁড়! কিন্তু যেমনি মায়ের মাটিটা খুঁজে পেলাম, গিয়ে সেখানে দাঁড়ালাম, অমনি...' উপযুক্ত কথা খুঁজে না পেয়ে বলল, 'বাবা, তুমি আমাকে বাধা দিও না। যা করতে চাই, করতে দাও।'

শেষ বাক্যে কাতর প্রার্থনা ছিল। দিনমণি নিরর্থক বললেন, 'কী করবি?'

'এখনও.....দেখি'

'এখনও জানি না। দেখি।' প্রজ্ঞা তার রান্নার দিকে ঘুরে গেল। কোমরে আঁচল।....

ইন্দ্র যেখানে দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছিল, সেখানে পাথরের মন্দির ফাটিয়ে অবাধ বটগাছের প্রসার। সামনে নীচে হাজামজা দিঘি। পানকৌড়ি, দলপিঁপি, বক, দুটো বুনো হাঁস—দলছুট হয়ে থেকে গেছে হয়তো। হাতে বন্দুক কিন্তু ইন্দ্র আজকাল খামোকা পাখি মারে না। বালক বয়সে হাতে বন্দুক পাওয়ার পর কাক কি শকুন, যা দেখেছে মারতে বন্দুক তুলেছে। টিপ অব্যর্থ হলে তবেই এই স্থিতধী স্বভাব আসে মানুষের, 'মারি তো গণ্ডার, লুটি তো ভাণ্ডার।' উনিশ বছর বয়সে শরবনে কোণঠাসা করে একটি বাঘকে মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গুলি ছোড়া এবং তাকে চুপচাপ মরতে দেখার পর নিছক হত্যার জন্য হত্যা তাকে আর মানায় না—সে এইরকমভাবে। কিন্তু প্রজ্ঞাকে হাতের টিপ দেখাতে চেয়ে দারুণ অপ্রস্তুত হয়। প্রজ্ঞা বলে, 'শুনেছি, পারেন। দেখব না।' ইন্দ্র অভিমানে বলেছিল, প্রজ্ঞা মাথায় একটা ফল নিয়ে দাঁড়াবে কি ? প্রজ্ঞা বলেছিল, এখানে ফল নেই। তা ছাড়া সে এত সহজে মরতে চায় না। অগত্যা ইন্দ্র একদলা কাদা একটা গাছে সেঁটে পিছিয়ে যায় এবং নির্দিষ্ট দূরত্বে বন্দুক তাক করে। কিন্তু সহসা লক্ষ্যপথে প্রজ্ঞাকে দেখতে পায়। বন্দুক নামালে প্রজ্ঞা বলে, 'ছিঃ ! এসব আপনাকে সাজে না। কাকে কী দেখাতে চাইছেন ? কেন ? ইন্দ্র জবাব দিতে না পেরে শুকনো হেসেছিল।

সে-আমলে মাঠঘাটে মানুষজন কদাচিৎ দেখা যেত। বনবাদাড়ে তো নয়ই। বড়জোর কোনও ক্ষুধার্ত আদিবাসী, হাতে তীর-ধনুক কি লাঠি-বল্লম। ঢালু আবাদি এবং অনাবাদি মাঠের পর বিলাঞ্চল, খড়ের জঙ্গল—স্বাধীনতা আর স্বাধীনতা। ঝুপসি সবুজ পাহাড় দেখায় ছোট ছোট গ্রামকে। হঠাৎ হঠাৎ প্রকৃতির খেয়ালে কোথাও উঁচু মাটি এবং গাঢ় জঙ্গল। বৃক্ষলতা সেখানে এমনই ঘনসংবদ্ধ যে মানুষকে পা রাখতে দেবে না। মারো, তারপর মরা বুকের ওপর হাঁটো। নদীর তীব্র বাঁকের মুখে তেমনি এক জঙ্গল, কিন্তু এটাই আশ্চর্য, নদী তাকে ত্যাগ করে সরে গেছে। রেখে গেছে শুকনো গভীর ক্ষতরেখা। আরও আশ্চর্য, এই জঙ্গলটির বড় ঢিলেঢালা, খোলামেলা চেহারা। উদাসীন দেখায় নিকটে গেলে। ইন্দ্রের অনেক পরে মনে পড়েছিল, এটাকেই লোকে 'খানকির টাঁড়' বলত। প্রথমদিন প্রজ্ঞা তার কাছে এলে টাঁড় কথাটা শুনেছে বলেছিল। সেই রাতেই তার মনে পড়ে যায় খানকির টাঁড়ের কথা। ভাগ্যিস তখন মনে পড়েনি। পড়লেও প্রজ্ঞার সামনে খানকি উচ্চারণ সম্ভব ছিল না। পরে যখন জানল, সেই 'খানকি-ই' প্রজ্ঞার মা, তখন তো শব্দটি চিরতরে নিষিদ্ধ হয়ে গেল।

এই জঙ্গলটিতে পৌঁছুতে ঘোড়া অনেক শ্রম বাঁচায়। কিন্তু স্ত্রীলোক এবং যুবতী, যাকে সে পাগলের মতো ভালবাসে, ঘোড়ার পিঠে সামনে না আগে বসাবে, জিনও একটি সমস্যা, কারণ জিনটি ছোট— ইন্দ্র অনেক ভেবে প্রথমদিন কিছুটা পায়ে হেঁটে, কিছুটা প্রজ্ঞার বকা খেয়ে পিঠে চেপে গমনাগমন করেছিল। অবশ্য সে প্রজ্ঞাকে ঘোড়ার পিঠে চাপতে বলেছিল এবং সে লাগাম ধরে হেঁটে আসতে চেয়েছিল। কিন্তু প্রজ্ঞা বলেছিল, 'আদিখ্যেতা পছন্দ করি না।' ইন্দ্র বুঝতে পেরেছে, সে, ইন্দ্র, সাহসী, কিন্তু তার যৌবন খুব ভীতু। বোকাও।...

দেরি দেখে সে, ইন্দ্র, তার যৌবনকে লাথি মেরে ঘুরেছিল মাঠের দিকে। খবর এসেছে, বিহারী গয়লাদের বাথানে বাঘে-মোষে একটা লড়াই হয়ে গেছে। শীতের মাঝামাঝি বিহার এলাকা থেকে বিহারী গয়লারা গরুমোষের বিরাট পাল ডাকিয়ে এনে কুলখাড়ির দিকে খড়ের জঙ্গলে বাথান করে। ফিরে যায় বর্ষার মুখে। মনগুজারি চরাণ খাজনা চারঠেঙে প্রাণী প্রতি এক পাই। তার উপরি দেয় রোজ সকালে দেড় সের দুধ। দুধটা পৌঁছে দেয় নিজেরাই। লোকগুলি জানোয়ারের সহবতে জানোয়ার-স্বভাবী মনে হলেও সমস্ত হৃদয়ে মানুষ। তাজা, সরল এবং অকুণ্ঠ। কুলখাড়ির চাষীদের সঙ্গে মারদাঙ্গা বাধে, আবার ভাবও হয়। ওদের বিদায় দিতে কুলখাড়ির যোয়ানরা বীরহাটা পর্যন্ত আসে। হাউ হাউ করে কাঁদেও। বীরহাটা হেসে অস্থির হয়।

'ইন্দ্রবাবু!'

ইন্দ্র দ্রুত দ্রুত ঘুরল। যার জন্য ছটফটকরা প্রতীক্ষা, তার ডাক কেন অতর্কিতে সাপের ছোবল মনে হয়, বুঝতে পারে না। শরীরে রক্তস্রোত খরতর হয় কেন? ভেবেছিল, আজ থেকে বেপরোয়া হয়ে তুমি-টুমি করবে। পারল না। অযথা মিথ্যাও বলল। 'একটা হরিয়াল...'

প্রজ্ঞা বলল, 'একটু দেরি হয়ে গেল হয়তো। আপনার মজহারচাচার পাল্লায় পড়েছিলাম। জানেন তো? খালি কথা আর কথা। কী বলেন, কিছু বোঝা যায় না। গাইয়ে ওস্তাদ লোকেদের এত বেশি কথা বলতে কখনও দেখিনি। মতিহারিতে, লখনউতে, দিল্লিতে, বাবার সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরেছি, গাইয়ে দেখেছি...' সে চোখে হাসল। 'বাঙালিরা খুব বলিয়ে হয় শুনতাম। না—আপনি ব্যতিক্রম।'

কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর ইন্দ্র বলল, 'ব্যতিক্রম? আমার...আসলে আমি মনে মনে কথা বলি।'

'কার সঙ্গে?'

'নিজের সঙ্গে।'

'সেই কথাগুলো আমার সঙ্গে বলুন। শুনতে শুনতে যাই। দূরত্ব কমে যাবে।'

ইন্দ্র একটু চমকে উঠে বলল, 'কিসের?'

'অন্নদামায়ের টাঁড়ের।'

ইন্দ্র হতাশ হল। আস্তে বলল, 'হুঁ।'

'হুঁ কী? বলুন, শুনি।'

ইন্দ্র একটু হাসল। 'আপনার বোঝা উচিত, আপনি বুদ্ধিমতী, নিজের সঙ্গে নিজের কথাগুলো গোপনীয় হয়।'

'তা তো হয়ই।'

'তা হলে?'

একটু চুপ করে থাকার পর প্রজ্ঞা বলল, 'আজ আকাশ মেঘলা। হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে না। তবে শুধু একটা কথা ভাবছি, আপনাকে হাঁটাচ্ছি কেন? অন্যদিনও ভাবিনি, তা নয়। তখন অবশ্য এলাকাটা আমার অচেনা ছিল। এখন তো আপনার মতো ইঞ্চি ইঞ্চি মুখস্থ।'

ইন্দ্রের মাথায় কৌতুক এল। 'আমি আপনার রক্ষী।' সে দেহরক্ষীই বলতে যাচ্ছিল। ত্বরিত শালীনতাবশে 'দেহ' উহ্য রাখল।

প্রজ্ঞা দাঁড়িয়ে গেল। বলল, 'নিজেকে ছোট করতে নেই। আপনার হাতে বন্দুক, এটা আপনার অভ্যাস। নিজেকে সঙ্গী ভাবতে দোষ কী?'

'সেও অভ্যাস করতে হয়। এতদিন আছেন। আমার কোনও বন্ধু দেখেছেন? সঙ্গী দেখেছেন?'

প্রজ্ঞা একটু হাসল। 'ওটা গুণের নয়, দোষের। বাবার সঙ্গে কত জায়গায় ঘুরেছি। যাযাবর ছিলাম আমরা। কত লোক দেখেছি, একলা থাকতে ভালবাসে। কী যেন একটা বিশ্রী কথা আছে, একলাষেঁড়ে না কী?'

'আমি তা হলে তা-ই।' ইন্দ্র পা বাড়িয়ে বলল। 'দোষের হলেও নিরুপায়। আমি নিজেই নিজের সঙ্গী—ছোটবেলা থেকেই।' সে একলাষেঁড়ে কথায় ষাঁড় আছে, জানে। কিন্তু অভিমানে জন্তুটির কথা বলল না।

প্রজ্ঞা আরও হেসে বলল, 'জমিদারি আভিজাত্য নয় তো? ভেবে দেখবেন কিন্তু।'

'আমি আভিজাত্য বুঝি না। জংলি আকাট মুখ্যু।'

'ব্রিচেস, ওই শিকারি জুতো, মাথায় হ্যাট-ফ্যাট সত্ত্বেও? জংলি···ওই

দেখুন।'

আগাছার ভেতর কালো পাথরের ভাস্কর্য, এমন স্থির এক আদিবাসী বৃদ্ধ। পায়ের শব্দে সে সজীব হল। কিন্তু নিষ্প্রাণ চাহনি। আরণ্য মৌন দুই চোখে ছবি হয়ে আছে।

ইন্দ্র বলতে যাচ্ছিল, সে মনে জংলি। সুযোগ পেল না। প্রজ্ঞা আদিবাসী বৃদ্ধের কাছে গিয়ে বলল, 'এখানে কী করছ তুমি ?'

বৃদ্ধ কষ্টকর ভাষায় বলল, 'য়েঁঃ ডাঁড়িয়ে আছে গোঃ ! কী করবে ?'

'তুমি থাকো কোথায় ?'

'য়েঁঃ চঢ়োকডাঙায় গোঃ।'

ইন্দ্র এসে বলল, 'শিকার খুঁজছে। আমার মতো শৌখিন নয়, সত্যিকার শিকারি। কেন এ কথা বলছি...'

প্রজ্ঞা দ্রুত বলল, 'জানি'। তারপর সংকীর্ণ আলরাস্তায় পা বাড়াল। 'আচ্ছা ইন্দ্রবাবু, এরা জমি পেলে চাষবাস করবে ?'

ইন্দ্র হাসল। 'জানি না। জিজ্ঞেস করলেন না কেন ?'

প্রজ্ঞা চুপ করে থাকল। সামনে শুকনো গভীর নালা। সবুজ দুর্বা মখমল হয়ে আছে। নালায় নেমে সে আকস্মিক দ্রুততায় ওপারের ব্যানাঘাস আঁকড়ে উঠে গেল। তারপর কৈফিয়ত দিল, 'উঁচুতে উঠতে গেলে দৌড়ুতে হয়। নওলপাহাড়ির নাম শুনেছেন ? সেখানে অন্যরকম জঙ্গল। মহুয়ার ফল পাকার সময় হয়ে এল। প্রচুর ভালুক আছে। ভালুক মহুয়া খেতে ভালবাসে। সেখানে বাবা একটা চতুষ্পাঠী খুলেছিলেন। তখন আমি বালিকা। টিলায় ওঠা খেলাটা ছিল দারুণ মজার। দৌড়ুতে দৌড়ুতে একেবারে মাথায়।'

ইন্দ্র ধীরে নালা পেরিয়ে বলল, 'আমি লক্ষ করেছি, আপনি আপনার জঙ্গলটার যত কাছাকাছি হন, তত মজহারচাচা আপনাকে ভর করেন।'

'কে জানে ?' প্রজ্ঞা শ্বাস ফেলল। আসলে ইন্দ্রের সঙ্গে এই গভীরতাগুলি অতিক্রমের সময় প্রতিবার তার কী এক আতঙ্ক জাগে। জঙ্গলটিতে ঢুকলে সে কিন্তু স্বচ্ছন্দ, নির্ভয়। মনে হয়, তার মা তাকে ঘিরে আছে। সে আবার স্বাভাবিক হল। বলল, 'নওলপাহাড়ির গল্প করতে ইচ্ছে হয়। বলি কাকে ? অন্যরকম জঙ্গল হলেও জঙ্গল। আসলে ভেতরে ভেতরে সব জঙ্গলই এক। চেহারায় যা তফাত।'

'আমি কিন্তু আপনার জঙ্গল বলেছি।'

'হুঁ, শুনেছি। আমারই তো।'

ইন্দ্র উড়ন্ত একঝাঁক টিয়াপাখির গতিপথে চোখ রেখে বলল, 'আপনার প্রজা !'

'পাখিগুলো ?' প্রজ্ঞার কণ্ঠস্বরে চমক ছিল।

'পাখিগুলো।' ইন্দ্র কপট গাম্ভীর্যে বলল। 'একটা জঙ্গলে শুধু পাখি থাকে না। পোকামাকড়, জন্তুজানোয়ার, গিরগিটি, তক্ষক, সাপ...'

প্রজ্ঞা তাকে থামিয়ে বলে উঠল, 'আমি এসব ভাবিনি তো ! কী আশ্চর্য ! আপনাকে ধন্যবাদ। আপনি সত্যিই জ্ঞানী মানুষ।'

ইন্দ্র কাপট্য চালিয়ে গেল, কৌতুকে। 'ইদানীং বিহারী গয়লাদের বাথানে যে বাঘটা হানা দিয়েছিল, তাকে আপনার জমিদারিতে বাস করতে দেখলে অবাক হব না।'

প্রজ্ঞাও কৌতুকময়ী হল। 'আমার জমিদারির বাঘ কাউকে মারতে দেব না কিন্তু !'

'সমস্যায় পড়া গেল তা হলে।' ইন্দ্র হাসতে লাগল। 'আজ যে বন্দুকটা দেখছেন, এটা রাইফেল। বাথান থেকে খবর পাওয়ার জন্য রাইফেল নিয়ে বেরিয়েছি। যদি দৈবাৎ বাঘটাকে পেয়ে যাই ভেবে।'

'আমার জঙ্গলে প্রাণীহত্যা নিষিদ্ধ ঘোষণা করলাম।'

'ঘোষণা ? ঢেঁড়া পিটিয়ে জারি করা হয় দেখেছি। তাই করুন।'

'হুঁউ, করব।'

ইন্দ্র এবার প্রকৃত গম্ভীর হল। 'বাবা সদরশহরে আছেন। এখনও জানেন না তাঁর আকাট মুখ্যু ছেলে কী করেছে। তবে আপনি দখল দাবি করছেন, বাতাসে খবর যাবে। তখন কী হবে, ভেবে দেখা দরকার।'

'শাসাচ্ছেন ?'

'আমি কে ?' ইন্দ্র আস্তে বলল। 'আমি জমিদার হব না। দেখবেন।'

প্রজ্ঞা জঙ্গল পর্যন্ত চুপচাপ থাকল। ইন্দ্রও আর কথা বলছিল না। জঙ্গলে ঢুকে প্রজ্ঞা বলল, 'আমি জানি, আপনার বাবার সঙ্গে একটা হাঙ্গামা হবে। আইন আমার দিকে। কিন্তু বনজঙ্গলে আইনের কী মূল্য ? আপনি ঠিকই বলেছেন, ভেবে দেখা দরকার।'

ইন্দ্র বাঘটা খোঁজার ভঙ্গিতে জঙ্গলের ভেতরটা দেখতে দেখতে বলল, 'কুলখাড়ি গ্রামে তো নিয়ে গেছি আপনাকে। ওরা দুর্ধর্ষ মানুষ, তাও বলেছি। সেলামি নিয়ে পত্তনি বন্দোবস্ত কিংবা উঠবন্দি জমায় ওদের মাটি দিতে পারেন। বাবা ওদের ভয় করেন।'

প্রজ্ঞা জঙ্গলে মায়ের শ্বাস-প্রশ্বাসের গন্ধে ততক্ষণে আবিষ্ট এবং বৃক্ষলতার মর্মর ধ্বনিতে কথা শুনছিল। প্রায় চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না।'

'না কী ?'

'জঙ্গল কাটতে দেব না। এই জঙ্গল আমার মা।' প্রজ্ঞা মুখ ঘুরিয়ে দাঁড়াল।

ইন্দ্র অবাক হয়ে বলল, 'কী ব্যাপার ? কাঁদছেন নাকি ?'

প্রজ্ঞা আবেগ সম্বরণ করে ভাঙা গলায় বলল, 'যা তা বলবেন না।'

উদ্দেশ্যহীন ভ্রমণ। তবু ইন্দ্রের ভাল লাগে। কারণ তার প্রিয়তমা নারী কাছাকাছি এবং এই অবাধ নির্জনতা। আর সে তার যৌবনকে মনে মনে তিরস্কার করে, প্রজ্ঞাকে ধর্ষণ করে শাস্তি দিতে চেয়েছিল হতভাগা। এখন সে তোর কত কাছে। হাত বাড়ালেই ছুঁতে পারিস। তার যৌবন খাপ্পা হয়ে বলে, ওরে নির্বোধ ! কোথায় কাছাকাছি ? মাঝখানে অতল খাদ। পা বাড়ালেই তলিয়ে যাবি। ইন্দ্র ফোঁস করে শ্বাস ফেলল।...

মজহারউদ্দিন বলতেন, পণ্ডিত বিহার মুলুকের লোক। এই বাংলা লোকবচনটি হয়তো জানা নেই। 'যে মেয়েটা দেখিনি/সে বড় মোহিনী। যার হাতে খাইনি/সে বড় রাঁধুনি॥' পণ্ডিতের মেয়ের সেই অবস্থা। যে মাকে দেখেনি, তার জন্য মাথাখারাপ করে বেড়াচ্ছে তাঁর ধারণা, আল্লা-ভগবান অদৃশ্য বলেই এত লোকে মাথা ঠোকে। পণ্ডিত কি ভেবে দেখেছে, শ্রীকৃষ্ণ বৃন্দাবনে থেকে গেলে শ্রীরাধা হা কৃষ্ণ হা কৃষ্ণ করে আকুল হতেন না !

দিনমণির মতে, তাঁর মেয়ে বড্ড বেশি আদিখ্যেতা করছে, এর পেছনে কারও কুচুটে হাত থাকতেও পারে। তন্ন তন্ন খুঁজছেন, পাচ্ছেন না। এটা সত্যি কথাই যে, তিনি ছোটবেলা থেকে মেয়েকে ইচ্ছে করেই তার মায়ের গল্প শোনাতেন। সাতকাহন করে ফেনিয়ে তুলতেন মেয়ের মায়ের চরিত্র। এখন বুঝতে পারেন, সেটা নিজেরই জ্বালা মেয়ের মনে ঢুকিয়ে দেওয়ার চেষ্টা। গঙ্গার ঘাটে গোরা সেপাইরা মেয়েদের পেছনে লাগত। অন্নদা লোক জড়ো করে তাদের শায়েস্তা করেছিলেন। তবে হাতে তলোয়ার নিয়ে ঝাঁসির রাণীর মতো যুদ্ধ করার গল্পটা নিছক বানানো। মেয়েকে তাক লাগানোর চেয়ে কুলটা অন্নদাকে ব্যঙ্গ করাই তাঁর উদ্দেশ্য ছিল। মেয়েকে তো বলা যায় না, তার রূপসী খানকি মায়ের জন্য প্রাণ দিতে মুলুকের রাজা-গজা-ডাকু-দারোগা সব সময় তৈরি ছিল !

মজহারউদ্দিন বলতেন, তাঁরও মাথাখারাপ হয়ে যাচ্ছে এসব কথা শুনে। অন্নদারাণীর চরিত্রের একটা দিক তাঁর কাছে স্পষ্ট হচ্ছে। অন্যদিকটা অস্পষ্ট।

ওই কদর্য বিশেষণটা যেদিকে সাঁটছে পণ্ডিত, সেদিকটা। কেঠো শাস্ত্রবাজ পাণ্ডা-পুরুত, তাতে নাকি মারাঠা, তাকে প্রেম দিতে না পারাটা বাঙালি কন্যা সুন্দরী স্ত্রীলোকের পক্ষে দোষের নয়। অগ্নিসাক্ষী এবং সপ্তপদী দুটি দেহকে জোড়তাপ্পি দেয়। পণ্ডিত কি জানে, মুসলমান পুরুষের বিয়েতে স্ত্রীলোকটির কাছে যে 'এজিন' বা সম্মতি চাওয়া হয়, তা শুধু সহবাসের সম্মতি ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পণ্ডিত ? হ্যাঁ, হ্যাঁ, পণ্ডিতকে ওই মন্ত্র আওড়াতে হবে না যদিদং হৃদয়-ট্রিদয়। এ মজহারউদ্দিন হিন্দুকে হিন্দু, মুসলমানকে মুসলমান। যে যা ভাবে, তাই। গুনু তবলচি মাকালীর পট টাঙিয়ে দিয়ে গেছে ঘরের দেয়ালে। সে আবার রমজান বেদের আঁকা। তার বাপের নামে ছিল পরান। মায়ের নাম সুবাসিনী। পণ্ডিত বুঝতে পারে না, হায় রে হায়। এ মজহারউদ্দিনের মতো কতলোকের দু-নৌকোয় পা। কখন দুই নৌকো দুদিকে সরবে, সেই ভয়ে তক্কে তক্কে নজর রেখে চলতে অতিষ্ঠ।

'একটা কথা ভাবছি ক'দিন থেকে।' এক বিকেলে বেড়াতে বেরিয়ে দিনমণি বললেন।

'শুনতে আপত্তি নেই।' মজহারউদ্দিন বললেন। 'তবে সাবধান। কথায় কথা বাড়ে/মন্থনে বাড়ে ঘি ॥ এ মুলুকের লোকবচন। এমন কিছু বোলো না, যাতে আমি একশো কথা শুনিয়ে ছাড়ব।'

দিনমণি হাসলেন না। খুব গম্ভীর তিনি। 'কুলখাড়ি যাব কি না ?'

'কিছু খবর হয়েছে ?'

'পঞ্চানন...'

'পাঁচু বলো। শুনতাম মহা লাঠিবাজ। মহরমের আখড়ায় বাজি ধরেছিল, তার হাতের লাঠি ফেলতে পারলে তার গোলাম হবে।' মজহারউদ্দিন হাসতে লাগলেন। 'কাছাড়িবাড়ির ভেতরে তাজিয়া নিয়ে খেলতে এসেছে। চাঁদুবাবু চেয়ারে বসে তাতাচ্ছেন। কী খেয়াল হল, আসরে ঢুকলাম। এক বাড়িতেই পাঁচুর লাঠি দুভাগ।'

দিনমণি অবাক হয়ে বললেন, 'তুমি সবেতেই ওস্তাদ তাহলে!'

মজহারউদ্দিন দ্রুত দু'কানের লতি ছুঁয়ে গুরুপ্রণামী সেরে বললেন, 'কী বলছিল ধান্দাবাজ ?'

'না—পঞ্চানন্দের স্বার্থ কী ? সে যা শুনেছে।' দিনমণি আস্তে বললেন। 'পারু কখন খানকির টাঁড়ের জঙ্গলে যাবে বলে কুলখাড়ির লোকেরা পথ তাকায়। জঙ্গলে লোকারণ্য। মাটির গন্ধে কী আছে, জানি না। নাকি খানকির

গায়ের সৌরভ।'

'ছিঃ! তুমি শালা আবার পণ্ডিত! অংবং শাস্ত্র পড়াও।'

গ্রাহ্য করলেন না দিনমণি। 'ওরা নাকি পারুকে সাধছে। জমিদার হাঙ্গামা করলে তারা রক্ত দেবে।'

'তুমি ওদের কাছে কেন যাবে?'

'বুঝিয়ে বলব, আমার মেয়ে পাগলি।' বলে হঠাৎ একটু উষ্ণ হলেন দিনমণি। 'হারামজাদির মায়ের স্বভাব—অবিকল। সঙ্গে লোক নিয়ে ঘোরে। হাতে বন্দুক তার। স্কুলে যতক্ষণ থাকি, বুঝতে পারি একশো চোখ আমাকে দেখছে। পালিয়ে যাব?'

একটু ভেবে মজহারউদ্দিন বললেন, 'একটা নিষ্পত্তি করা যায়।'

'কিসের?' ক্রুদ্ধ দিনমণি তাকালেন সঙ্গীর দিকে।

'এসবের।' মজহারউদ্দিন হালকা মেজাজে বললেন। 'ইন্দ্রের সঙ্গে পারুর যদি...'

'বিয়ে?'

'হ্যাঁ।'

'নাঃ।'

'চাঁদুশালা একটু খামখেয়ালি। তবে আমাকে খাতির করে। খুলে বলব না। আমি চাপ দিলে না করবে না। আর...' মজহারউদ্দিন গলা চেপে বললেন, 'ইন্দ্রের যা অবস্থা, তোমার মেয়ে পায়ের তলার বেদী হতে বললে তখনই হবে। এখানকার কালীপুজোয় খুব ধুমধাম হয়। সেই মাটি। পুরুষলোকেরা বুকপেতে চিত হয়েই আছে।'

'তুমি কী করে ভাবতে পারছ, এত কাণ্ডের পর ওই বংশে আমার মেয়ে...' ক্ষোভে দিনমণির কথা থেমে গেল। চোখে জল। পিটপিট করে তাকিয়ে বললেন, 'হারামজাদি আমাকে নরকে টেনে এনে রেখেছে। এ জ্বালা তুমি বুঝবে না। তুমি তো ছেলেমেয়ের বাপ নও হে! আমার ছুঁচোগেলা অবস্থা।'

মজহারউদ্দিন হঠাৎ রেগে গেলেন। 'ধুস্ শালা! বিয়ে তুই করবি, না তোর মেয়ে করবে? মাগিমুখো ন্যাকা! আ রে বুদ্ধু! গাছ সাক্ষী করে হিন্দুদের বিয়ে হয়। জঙ্গলে অনেক গাছ আছে। তুই জানিস, অ্যাদ্দিনে কিছু করছে কি না?'

দিনমণি চুপচাপ পা ফেলছিলেন। অনেকক্ষণ পরে ভাঙা গলায় ডাকলেন, 'মজহার!'

'আমার ওপর রাগিস না, ভাই। একটা কথা বলি, শোন্। অনেক দেখেটেখে

বুঝেছি, মানুষের নিজের ওপরই নিজের এক্তিয়ার নেই তো অন্যের ওপর! মেয়েকে এত বোকা ভাবিস না।'

দিনমণি শ্বাস টেনে বললেন, 'তোমাকে বলেছিলাম...'

'দর বাড়াস নে। তুই-তোকারি কর। তুই এক জাতনাশা, আমিও এক জাতনাশা।'

অগত্যা দিনমণি বললেন, 'তুই কথা দিয়েছিলি, পারুকে বাজিয়ে দেখবি।'

মজহারউদ্দিন হাসলেন। 'ধড়িবাজ। তবে ঘুঘু দেখেছে, এখনও ফাঁদ দেখেনি। ফাঁদে আটকাব। একটু সবুর ভাই পণ্ডিত।'

মজহারউদ্দিন গুনগুন করে পুরিয়া ভাঁজতে থাকলেন। নদীর দিক থেকে জোরালো হাওয়া এসে সুরটাকে ছিঁড়ে-ছিঁড়ে নিয়ে যাচ্ছে। দিনমণি সুরের দিকে কান পেতে ছিলেন। সহসা ধারণা হল, সুরটা তাঁর মগজের ভেতরকার সূক্ষ্ম জিনিসগুলি স্পর্শ করছে। ক্রমে তিনি নৈর্ব্যক্তিক হয়ে পড়ছিলেন। গায়ক চুপ করলে আবার নিজেকে ফিরে পেলেন এবং বুঝলেন, গান জিনিসটার এই একটা প্রচণ্ড শক্তি আছে। ব্যক্তিদের নৈর্ব্যক্তিক করে ফেলে। প্রয়াগে এক সাধু তাঁকে বলেছিলেন, ধ্যানে বসলে আমি-ভাব ঘুচে যায়। আমি-ভাব ঘুচলে মুক্তি-ভাব আসে। সে জিনিসটা কী? পার্থিব সকলকিছু তুচ্ছ হয়ে যায়। দিনমণি রেগে আগুন হয়ে বলেছিলেন, তুচ্ছ হয়! তোমার চিমটেটা দাও। ধ্যানে বসো। আমি তোমাকে খোঁচা মারব। আর তুমি কি বাতাস খাও? ওই লেংটিটা পরে আছ। তাঁতি বুনেছে। আমার কথায় ন্যাংটো হতেও পারো। কিন্তু প্রস্রাব-মলত্যাগ—এইসব জৈব নিয়মাধীন দেহ যতক্ষণ বিদ্যমান, ততক্ষণ তুমি একজন 'তুমি'। বাসাংসি জীর্ণানি এসব আওড়াচ্ছ। মরে দেখাও, দেখি।

সাধুরা দল বেঁধে ঘোরে। চিমটে তুলে তাড়া করেছিল দিনমণিকে। মজার কথা, নিজেও তখন এক পাণ্ডা। তারও পাণ্ডাদল ছিল। সাধুদের ভাগিয়ে দেয়। প্রয়াগে এমন হাঙ্গামা চিরাচরিত।

ফেরার পথে গল্পটা মজহারউদ্দিনকে শুনিয়ে বললেন, 'আজকাল তোর গুনগুনানি শুনে মনে হয় সাধু কী বলেছিল, বুঝতে পারিনি তখন। সুরে মন একমুখো হয়। সুর ছাড়া তখন বাকি সবকিছু তুচ্ছ। ধ্যান জিনিসটা হয়তো এরকম কিছু।'

'তাই-ই।' মজহারউদ্দিন সায় দিলেন। 'সঙ্গীতশাস্ত্রে রাগ-রাগিনীর মূর্তির কথা আছে। আমি মুসলমান লোক। হঠাৎ খেয়াল হলে নামাজও পড়ি।' দু'কান ছুঁয়ে গুরুপ্রণাম সেরে বললেন, 'চিত্তের অস্থিরতা হে! ওস্তাদজি

বলতেন, তোরা নিরাকার ভজিস। কিন্তু রাগ-রাগিনীর মূর্তি আছে। না ভজলে সিদ্ধি হয় না। এই যে পুরিয়া-ধ্যানেশ্রী ভাঁজছিলাম, উঁহু ! ভজছিলাম। সামনে মূর্তি ছিল। ধ্যানেও মূর্তি মনের সামনে রাখতে হয় বোধ করি। সে একটুকরো পাথর হোক, কি আলো হোক। সুফি দরবেশরা গাইয়ে হয়। এক দরবেশ বলেছিল, মনের সামনে চেরাগ জ্বলে।'

'তোর ওস্তাদজি তা হলে হিন্দু ছিলেন ?'

প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে মজহারউদ্দিন বললেন, 'কুলখাড়ির কথা ভুলে যা। চাঁদুশালা খেয়াল করেনি তোর মেয়ের নাম প্রজ্ঞা। তোকেও সে চেনে না। তা হলে মাস্টারি দিত না।'

'খুলে বলি। আমার নাম দিনমণি নয়।'

'আ রে ! আমার হাতে হাঁড়ি। তুই গণেশ লালকর শাস্ত্রী।'

দিনমণি থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। বজ্রাহত তালবৃক্ষ। মাথায় দাউদাউ আগুন। পশ্চিমের টুকরো টুকরো মেঘের আড়ালে সূর্যাস্ত হওয়ায় যে লালচে ছটা কোমল দেখাচ্ছিল, এতক্ষণে রক্ত আর আগুনের রঙ-বেরঙ।

ঘড়ঘড়ে গলায় বললেন, 'তুই কে ?' যেন নিজেকে প্রশ্ন করছেন।

মজহারউদ্দিন বললেন, 'শ্রীমতী অন্নদারানী দেব্যার স্বামীর নাম গণেশ লালকর শাস্ত্রী। দলিল করতে হলে সধবার স্বামীর নাম লেখা ইংরেজের আইন। দলিল লেখক আসগর হোসেন। ইসাদি বা সাক্ষী তবরেজ সেক। টিপ ছাপ। শ্রীনারায়ণ পাণ্ডে । সই। তিনজনই মরে ভূত হয়ে গেছে। এবার তোর মাগের উইলের বৃত্তান্ত শুনবি ?'

'অ'। দিনমণি কষ্টে বললেন। 'তাহলে তোরই কেরামতি !'

মজহারউদ্দিন বললেন, 'সেরেস্তার চাকরিতে আমাকে ঢুকিয়েছিলেন অন্য মহালের নায়েব। আমার মামুজি। চাঁদুশালার ঠাকুর্দার আমলের লোক। রায়-রায়ানদের বংশের হাঁড়ির খবর জানতেন। সেই হাঁড়ি আমার জিম্মায়। চাঁদু আমাকে এড়িয়ে থাকে। পাঁচু পাইকের লাঠি ভেঙে দু টুকরো করেছিলাম, সেও এক ভয়। ছেলেকে বন্দুকবাজ করেছিল। যেন জানত, আমি একদিন আসব।'

দিনমণি ছটফট করে বললেন, 'তোর হাঁড়িতে আর কী কী আছে ?'

'আর যা আছে, তোর জেনে লাভ নেই।' মজহারউদ্দিন কিছুক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বললেন, 'পাঁচু জঙ্গলে লোকারণ্যের খবর জেনেছে। চাঁদু এল বলে ! সদর শহরে ওর বাড়ি দেখেছিস ?'

'নাঃ।'

'দেখে আসিস। নবাবদের এক শরিকের বাড়ি। কিনেছিল এক আরমানি রেশম কারবারি। তার হাতফেরতা হয়ে সৈয়দাবাদের রাজার হাতে যায়। রাজার সম্পত্তি কালেক্টার নিলামে বেচল। চাঁদুর ঠাকুর্দা কিনল। ইংরেজের আইনের ফাঁদ হাতিধরা।' মজহারউদ্দিন শিশুহাস্যের পর বললেন, 'ইন্দ্রের মায়ের জন্য কষ্ট হয়। ছোঁড়াটাও রামছাগল। বনবাদাড়ে গুঁতিয়ে বেড়ায়। মা চেনে না। ওদিকে চাঁদুর দ্বিতীয়পক্ষ গর্ভবতী হয়েছে। সে-বউ শহুরে। গাঁ-গেরাম শুনলে নাক সিঁটকোয়। নাকি কলেজে পাশকরা মেয়ে। দেখিনি।'...

কাছারিবাড়িতে ঢুকতেই কথাটা সত্য হল। প্রাসাদ-সোপানের নীচে সেই অস্টিন মোটরগাড়ি। হলঘরের বারান্দায় ঝাড়বাতিটা ঝলমল করছে। সোপানে জনাকতক পাইক বসে আছে। মাথায় লাল ফেট্টি। বরাবরকার এই ভড়ং বা কেতা।

দিনমণি মজহারউদ্দিনকে খবর দেবেন ভেবে ঘুরে দাঁড়াতেই তাঁর দেখা পেলেন। মজহারউদ্দিন আস্তে বললেন, 'নিজের ঘরে গিয়ে বসো। শাস্ত্রবই থাকলে খুলে বসে থাকো গে।'

হলঘরের ভেতর আলোয় দেখা যাচ্ছিল কর্মচারীরা দাঁড়িয়ে আছেন। মজহারউদ্দিন সেই দলে গিয়ে ভিড়লেন। দিনমণি আতঙ্কমিশ্রিত কৌতূহলে সোপানের কয়েকটি ধাপে উঠে হলঘরের চওড়া দরজার দিকে তাকালেন। একজন গোরা সায়েব আর একজন মেম বসে আছে।

প্রজ্ঞা উনোনে শুকনো পাতা ঠেলে দিচ্ছিল। হাঁড়িতে ভাত ফুটছে। দিনমণি ফিরে এসে আস্তে বললেন, 'বিপদ!'

'কী হয়েছে?'

'আমরা ধরা পড়ে গেছি।'

প্রজ্ঞা মুখ তুলল না। নির্বিকার ভঙ্গিতে বলল, 'কে কাকে ধরে।'

দিনমণি ঘরে ঢুকে বন্ধুর কথামতো শাস্ত্রপুস্তক খুলে বসে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রজ্ঞা ঘরে ঢুকে বলল, 'সন্ধ্যা-আহ্নিক কর না। কিন্তু বাইরে ঘুরে এসে কাপড় না ছেড়ে হাত-পা না ধুয়ে শাস্ত্র খুলেছ। এই পাপেই তো...'

'চুপ কর।'

'মা আমাকে বলেছে, তোর বাবাকে বলছি। যে ধর্মকে ছাড়ে, তাকে সব কিছুই ছাড়ে।'

বাঁকা মুখে দিনমণি বললেন, 'সে নিজেও তো ধর্মকে ছেড়ে অধর্মে নেমেছিল!'

'সন্ন্যাসিনীদের দেখলে অধর্ম পালিয়ে যায়।'

'তোকে এবার বলার সময় হয়েছে, তোর মা সন্ন্যাসিনী ছিল না।'

'জানি তুমি কী বলবে।' প্রজ্ঞা স্থির জলের স্বচ্ছতা মুখে এনে বলল। 'এখানে লোকেরা যা বলে, তুমি তাই বলবে। কিন্তু আমি শুনব না। মাকে কখনও দেখিনি বলেই আমার মা আমারই বানানো। সেই মা আমার কাছে সত্য, বাদবাকি সবই মিথ্যা।'

দিনমণি চুপ করে গেলেন। প্রজ্ঞা আবার সংসারে লিপ্ত হল। কতক্ষণ পরে দিনমণি যখন খেতে বসেছেন, মজহারউদ্দিন এলেন। বারান্দার নীচে দাঁড়িয়ে বলে গেলেন, 'আঁচ করা গেল না। তবে কালেক্টারের এক দোস্ত-দোস্তান এসেছে বিলেত থেকে। বাঘমারার খুব শখ। বাঘের খবর হয়েছে কুলখাড়ির ওদিকে। তাই'।...

॥ ৩ ॥

এরাতে নদীখাতে ভরাট বালি এখন বসন্তকালে অন্তর্নিহিত সিক্ততার দরুন আঁটো। ঘোড়া আপন মর্জিতে হাঁটছিল। পিঠের জিনে একটা মানুষ আছে, খেয়াল নেই। দুধারের উঁচু পাড়ে আরও উঁচু গাছপালার মাথায় একটু কাত হয়ে সোনা ঢালছিল ভাঙা চাঁদ। বাঁকের পর নদীও বুকে খানিকটা সোনা পেল। শূন্যতা এভাবে কিছুটা পূর্ণ হল।

তারপর ক্রমাগত বাঁক নিতে নিতে একটি দহে রিক্তা নদী সহসা ঐশ্বর্যময়ী সালঙ্কারা, ইন্দ্র রাশ টানল। ঝলমলানি দেখে মনে প্রজ্ঞার উদয়। ডাকলে কি এতরাতে সঙ্গে আসত ? ইন্দ্র জানে না। জ্যোৎস্নায় খানকির টাঁড়ের জঙ্গল কি দেখতে ইচ্ছে করে না প্রজ্ঞার ? জ্যোৎস্নারাতে জঙ্গলের সত্যিকার নিজস্ব চেহারা ও ভাষা বোঝা যায়। অন্ধকারে চরাচর একীভূত সত্তা, তার ভাষা জীবজগতের। শেয়াল, পেঁচা, বাঘ, ভূতপ্রেতিনী, পোকামাকড়ের নিজের-নিজের ভাষা স্বাতন্ত্র্য হারায়। মানুষও নিজেকে হারিয়ে ফেলে। তাই আলো জ্বালতে হয়।

জুগজুগে আলো চোখে পড়ল ঢালু পাড়ের মাথায় উঠে। ডাইনে কিছুদূর গেলে কুলখাড়ি। বাঁদিকে আবাদি-অনাবাদি মাঠের শেষে খানকির টাঁড়। মাঝখানটায় টানা কাশ-কুশের জঙ্গল। সেই জঙ্গলের ভেতর আলো। নাখুরাম-কাহ্নাইয়া-ভরতদের গোরুমোষের বাথান। আলোটা কমছে বাড়ছে। কুণ্ড জ্বেলেছে। ঘোড়া নেমে গেল। এলাকার মাটি তারও ইঞ্চিইঞ্চি চেনা।

সাপের গন্ধ পেলেই নাকে একটা চাপা শব্দ করে, সেটা হ্রেষাধ্বনি। তবে বিষধর সাপ ভীতু। ভীতু বলেই ছোবল মারে কিংবা পালিয়ে যায়। নিচু বাঁধে কুলের জঙ্গল দুধারে। মোটা আল আসলে। জমিদারি করুণার প্রমাণ এইটুকুই। ইন্দ্রের মনে চিন্তা এল, সে জমিদার হতে চায় না। হলে দেখিয়ে দিত, মানুষের জন্য মানুষের কী কী করা উচিত। কিছুদূর এগিয়ে বাঁদিকে নীচে নামল ইন্দ্র। আরও বাঁদিকে কালো টিলার মতো খানকির টাঁড়ের জঙ্গল। কিন্তু সেদিকে গেল না। এতক্ষণে ঘোড়াটা অনিচ্ছা-অনিচ্ছা করে হাঁটছে। এলোমেলো হাওয়া দিচ্ছে। বাঘেরগায়ের গন্ধ পেল নাকি? হাঁটুর চাপ দিয়ে বাহনকে ইন্দ্র বোঝাচ্ছিল, বেপরোয়া হওয়া দরকার। তারপর রাইফেল পিঠ থেকে খুলে জিনের সামনে রাখল। টর্চটাও তৈরি রাখল, যাতে নলের ডগায় ক্লিপের সঙ্গে মুহূর্তে আটকানো যায়।

গোরুগুলিকে ঘিরে মহিষগুলি বসে ছিল। সহসা ধুড়মুড়িয়ে উঠে দাঁড়াতেই নাথুরামের দল হইহল্লা এবং টিন পেটাতে শুরু করল। ইন্দ্র খাপ্পা হয়ে সমতল নরম দুর্বাঢাকা মাঠে ঘোড়াটিকে দৌড়ুতে বাধ্য করেছিল। কাছাকাছি গিয়ে রাশ টানলে ঘোড়াটি সামনের দুই ঠ্যাঙ শূন্যে তুলে মাটিতে নামাল। রাইফেলটি আর একটু হলে পড়ে যেত। ইন্দ্র টর্চ জ্বালল।

নাথুরাম দেখতে পেয়েছিল। দৌড়ে এল। 'জে ছোটাহুজৌর! শোচা কি...পরনাম, হজৌর, পরনাম! কসুর মাফ করনা পরভুজি।' সে গোষ্ঠপতি বলে ইলেমদার।

খুব হাসাহাসি পড়ে গেল বাথানে। কে কতটা ভয় পেয়ে কী কী করেছে, সেইসব কথা ও তর্কও। বন্যায় উপড়ে যাওয়া নিচু হিজলের একটা ডালে ঘোড়াটি বেঁধে ইন্দ্র কম্বলে বসল। পরনে ব্রিচেস। বসতে অসুবিধা। বলল, 'শেরকা খবর?'

কাহ্নাইয়া স্বচক্ষে দেখেছিল বাঘটিকে। হাতমুখ নেড়ে বলল, 'বড়া শের হুজৌর! এত্তা বড়া শের ইয়ে মুলুকমে কভি দেখা নেহি। উও সাল জোঠো দেখা, ছোটা শের।' সে কোথায় সেটা কী ভাবে দেখেছে, সবিস্তারে বলতে ভূমিকা বাঁধল। আগুনের কুণ্ডটি দাউদাউ জ্বালছিল। মুখগুলি উত্তেজনায় ভাজাভাজা। এত রাতে ঘোড়ার পিঠে ছোটহুজুরকে তারা আশা করেনি। কল্পনায় আসে না তাদের এমন অবির্ভাব। হ্যাঁ, ঘোড়সওয়ার তাদের চোখসওয়া। কিন্তু এ তো রূপকথার তুল্য। বাঙ্গালমুলুকে এমন ঘোড়া, সেও দর্শনযোগ্য। তার চেয়ে বড় কথা, বীরহাটায় তাদের ত্রাণকর্তা সত্যি আছেন।

বিরক্ত ইন্দ্র বাঘটির কথা তুলল। তখন কাহ্নাইয়া বলল, সে-রাতে তাড়া খেয়ে পালিয়ে যায় বাঘটা। তারপর বাথান চক্কর দিয়ে বেড়াচ্ছে। বিলের ধারে নরম মাটিতে পায়ের ছাপ দেখেছে। তারা সতর্ক। তবে আজ বিকেলে একটা কাঁড়া মোষ দলছুট হয়েছিল। তাকে ফিরিয়ে আনার পথে নালায় বাঘটার মুখোমুখি। সে মোষের পিঠে বসে ছিল। হাতে বল্লম। কিন্তু মোষটা শিঙ বাগিয়ে দাঁড়ায়, সে বল্লম তাক করে এবং মুখে খুব হাঁকডাকও ছাড়ছিল। বাঘটা একলাফে কাশবনে গিয়ে ঢোকে। দেখতে মোষটার আয়তন। কাহ্নাইয়া দুহাতে বেড় দিয়ে মাথার মাপও দেখাল।

ইন্দ্র হাসতে লাগল। গোষ্ঠপতি নাথুরাম বলল, হাসা স্বাভাবিক। কাহ্নাইয়া একটু বেশি কথা বলে। তবে বাঘটা তাদের কাছে প্রচণ্ড সমস্যা হয়ে উঠেছে। আটজন লোক, পঁচিশটে মোষ, নব্বইটা ছোট-বড় গোরু। বিলের দিকে ঘাসের দুনিয়া। কিন্তু গাঁওবালারা বোরোধান রুয়েছে। তিলের বীজ ছড়িয়েছে। এই বছর কী একটা হয়েছে, তারা জানে না। বাঙালি গয়লারা এ বাথানে গল্প করতে আসে না। নাথুরাম চেপে গেল, গাঁজা খেতেও কেউ আসে না। আর কিছুদিন পরে তাড়ি চোঁয়াবে তালগাছের ডগা থেকে। তখন তাড়ির হাঁড়ি নিয়েও কি আসবে কেউ ? বংশপরম্পরা এই রেওয়াজ চলে আসছে। এটা সত্যি কথা, একসাল আহিরডির উদ্ধবের বউকে নিয়ে রঘুয়া নামে এক জোয়ান ছোকরা ভেগে যায়। রঘুয়া দুমকার দিকে কোথায় যেন আছে। উদ্ধবকে খবর দেওয়া হয়েছিল। যায়নি কেন ?

ইন্দ্র উঠে দাঁড়িয়ে বলল, কাহ্নাইয়া তাকে সেই নালাটা এবং সঠিক জায়গাটা দেখিয়ে দিক। কাহ্নাইয়া সঙ্গে সঙ্গে আঙুল তুলে দিকনির্দেশ করল। বোঝা গেল, সে একপা বাড়াতে রাজি নয়। মুখে বলল, 'মাইজিকি টাঁড়কা বিচমে। দো-তিনশও পাঁও দূর। ছোটাহুজৌরকো সবহি মালুম !' সে কাঁচুমাচু মুখে হাসছিল।

এরা খানকির টাঁড়কে মাইজির টাঁড় বলে কেন ? প্রশ্নটা ইন্দ্রের কাছে এতকাল জরুরি মনে হয়নি বা এটা প্রশ্নযোগ্য কিছু। সে জানতে চাইল, মাইজির টাঁড় কী ? তার প্রশ্নে উত্তেজনা ছিল।

গোষ্ঠপতি করজোড়ে নমো করায় ইন্দ্র আরও অবাক হয়ে গেল। তারপর নাথুরাম বলল, তার বয়স ষাটের ওপর চলে গেছে। সে স্বচক্ষে মাইজিকে দেখেছে। মন্দির ও আশ্রম দেখেছে। নদী বড় বানের বছর দূরে সরে যাওয়ার সময় সেই অংশটা খেয়ে ফেলে। মাইজিকে তারা প্রণামী দিয়ে আসত।

আশ্রমের জন্য দুধও যোগাত। একসাল কাঙালিভোজন হল। বাথানওয়ালারাও খেয়েছিল। মাইজি স্বয়ং দেবী ছিলেন।

ইন্দ্রের এ এক রোমাঞ্চকর আবিষ্কার। ঘটনাপরম্পরায় এই জ্ঞানলাভ হল। মজহারচাচার তত্ত্ব-অনুসারে, আমরা যা জানি, তাই আমাদের জ্ঞান। প্রজ্ঞা বলেছিল, দুরকমের জ্ঞান আছে। তা হলে ইন্দ্র যা জানত সেটা একরকম জ্ঞান এবং এখন যেটা জানল সেটা দ্বিতীয়রকমের জ্ঞান। প্রজ্ঞাকে খবর দিলে ছুটে আসবে নাথুরামের কাছে। কিন্তু ইন্দ্র প্রজ্ঞাকে কথাটি বলবে কি বলবে না, বললে আরও কী কী ঘটবে, চিন্তাযোগ্য বিষয়।

ইন্দ্র বলে গেল ঘোড়াটার দিকে নজর রাখতে। বাঘটা তার গুলি মাথা পেতে নেওয়ার জন্য সেখানেই অপেক্ষা করছে না সে জানে। বাঘ শিকারের অভিজ্ঞতা তার নেহাত মামুলি। সে শুধু এটুকু বুঝতে পারছে, বাঘটা ক্ষুধার্ত এবং বাথানের একটি প্রাণীর ওপর লোভাতুর। তাও না জুটলে কোনও গ্রামে গিয়ে হানা দেবে, গোরুছাগল যা মেলে। এমনও হতে পারে, এখন সে ঠিক তাই করতে গেছে।

তবু এক অমোঘ আকর্ষণে ইন্দ্র হাঁটতে থাকল নালাটির দিকে। কেউ ডাকছিল কি ? ইন্দ্র প্রশ্ন করে জানতে চাইল মনেরভেতর। প্রজ্ঞার মা ? নাথুরাম বলছিল, স্বয়ং দেবী ছিলেন। ব্যাঘ্রবাহিনী হোন না কেন তিনি ? এ রাতে তাঁকে তাঁর মেয়ের মতোই অনুভব করতে চায় ইন্দ্র। সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে, সমস্ত অনুভূতির মধ্যে। তার ঠাকুর্দা ঠকেছিলেন, না অন্নদারানী ঠকেছিলেন, সেটা আলাদা প্রশ্ন। ঘটনাটি জানার পর থেকে সে হলঘরে হরনাথের তৈলচিত্রের সামনে দাঁড়িয়ে থেকেছে কতবার। খুব একটা সুপুরুষ বলা চলে না। চোগা, চাপকান, পূর্বপুরুষের উষ্ণীষ মাথায় বেমানান একটা লোক। এটা হরনাথের যৌবনের ছবি অবশ্য। তেইশ বছর আগে তাঁর বয়স ছিল বাষট্টি, ইন্দ্র হিসেব করে দেখেছে। এটাই অদ্ভুত লাগে। যুবতী—অন্নদারানীকে ওই মানুষ কী গুণে পেতে পারেন ? কোথাও একটা গণ্ডগোলআছে। প্রতারণা আছে। একতরফা, অথবা দুতরফাই। সময় চলে যেতে যেতে কত রহস্য ছড়িয়ে রেখে যায়।

জংলি মানুষের কী এক বোধ কাজ করে। টর্চ জ্বালতেই কাশবনের ভেতর পায়েচলা পথে একটা নিস্পন্দ সাপ দেখতে পেল ইন্দ্র। চকরা-বকরা রঙ। চন্দ্রবোড়া। পা পড়লে কামড়াত। পায়ে হান্টিং জুতো আছে। কিন্তু চন্দ্রবোড়া নাকি লাফ দিয়ে কামড়ায়। তীক্ষ্ণ দাঁত। ব্রিচেস ফুঁড়ে ঢুকে যেত উরুতে। ইন্দ্রের দেহ গলেপচে যেত। সে দেখেছে এই ঘটনা। টর্চের তীব্র আলোয় ধরা পড়ে সাপটা খুব আঁকাবাকা হয়ে পালাতে চাইছিল। জুতো ঠুকলে আরও অস্থির

হয়ে পালিয়ে গেল। গোখরো-কেউটে হলে আলোর সামনে ফণা তুলে হিস হিস গজরাত। শঙ্খচূড় হলে বেপরোয়া লেজে ভর করে আলোকেই ছোবল দিত। গতবছর জৈষ্ঠ্যে তিলক্ষেতে একটা শঙ্খচূড় মেরেছিল ইন্দ্র। কুলখাড়ির ভাদু শেখ বলেছিল, কাজটা উচিত হয়নি। শঙ্খচূড় সাপ হয়েও সাপ খায়। যেখানে থাকে, তার চারদিকে ক্রোশবরাবর কোনও সাপ থাকে না। আর বিশেষ কথা, শঙ্খচূড় গোখরো-কেউটে-চন্দ্রবোড়াদের মতো চোরছ্যাঁচড় নয়। তার মানে, আচমকা চোরা কামড় দেয় না। দূর থেকেই মাথা পাঁচ হাত তুলে সাড়া দেয়, খবর্দার! আমি আছি। কাজেই 'বাবুর ব্যাটা' উচিত কাজ করেননি। কুলখাড়ির লোকেদের ভাষা বৃক্ষবৎ নগ্ন।

এরপর ইন্দ্র পায়ের সামনে সাবধানে টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে হাঁটছিল। কাশবন শেষ হলে ধাপবন্দি আবাদি মাঠের নীচে নালাটি দেখা গেল। কিছুক্ষণ নালার ধারে দাঁড়িয়ে 'মাইজির টাঁড়ের' জঙ্গলটির দিকে তাকিয়ে রইল ইন্দ্র। চাপচাপ দুর্বাঘাসে ঢাকা নালার বুকে বাঘের পায়ের ছাপ খোঁজার বিদ্যা লাগে। সে ট্র্যাকার নয়। সত্যিই 'বাবুর ব্যাটা'। বাঘটার কথা ভুলে গেল সে। অথচ এই নৈশ অভিযানের উদ্দেশ্য ছিল সেই জন্তুটি। বাবা সঙ্গে এক গোরা শিকারি এনেছেন। তার এক নীলনয়না স্বর্ণকেশিনী মেম। এতে ইন্দ্রের কিছু মনে করার কথাও নয়। ঘটনাটিও নতুন নয়। কিন্তু গোরা শিকারি ইন্দ্রের দুটো বন্দুক আর এই রাইফেলটাকে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করল যেন। নিজের রাইফেল আর শটগান দেখিয়ে ইংরেজিতে একঘণ্টা বকবক করল। চন্দ্রনাথ বললেন, 'মিঃ ক্লিনস্টোন নামকরা শিকারি। ওঁর সঙ্গে ঘুরে শিকারবিদ্যা শিখে নাও। এমন সুযোগ পাবে না।' কিছুক্ষণ পরে ইন্দ্র মনেমনে প্রতিজ্ঞা করে, আজ রাতে বাঘটা মেরে লেজ ধরে টানতে টানতে নিয়ে আসবে। প্রথম বাঘ মারার পর তাই করতে যাচ্ছিল। উৎসাহী লোকেরা বাধা দেয় এবং বলে, এই কাজটা তাদেরই সাজে। রুদ্রপুর থেকে মেহদু মুচি এসে চামড়া ছাড়িয়ে চমৎকার ট্যানিং করে দিয়েছিল। তারপর কাঠের গুঁড়ো আর কাঠ ঠেসে স্টাফ করে বেদীতে বসিয়ে গিয়েছিল। সেই বাঘ দেখে ক্লিনস্টোন বলল, 'নট আ রিয়্যাল টাইগা। সো স্মল! জাস্ট আ বিগ ক্যাট!' ছোট হোক, বড় হোক, বাঘ হচ্ছে বাঘ। শালা গোরা!

চোট খাওয়া চাঁদটি আকাশের মাঝখানটিতে থমকে গেছে। ধূসর জ্যোৎস্নায় কালো রহস্যময় বৃক্ষলতা একটি উন্নত বিশালতা হয়ে আকর্ষণ করছে। কাছে গেলে যদি দেখতে পায় ব্যাঘ্রবাহিনী দেবীকে? ইন্দ্র, তুমি কী করবে? ইন্দ্রের যৌবন এই প্রশ্নটি তুলল। ইন্দ্র বলল, গুলি করব। ইন্দ্রের যৌবন বলল, প্রজ্ঞার

নিষেধাজ্ঞা মনে পড়ছে না ? ইন্দ্র দোনামনা করে বলল, তাই তো !

দূরে কোথায় টিট্টিভ ডেকে উঠল, ট্রি ট্রি ট্রি···ট্রি ট্রি ট্রি···

প্রকৃতির খুব ভেতর থেকে একটা বিষণ্ণ সাড়া আসছে। কাশবনে বাতাসের শব্দ। অস্বস্তিকর, একঘেয়ে আর উদ্দেশ্যহীন শনশনানি। কিন্তু টিট্টিভটা ক্রমাগত ডাকছে ট্রি ট্রি ট্রি···ট্রি ট্রি ট্রি···ঈষৎ আনুনাসিক ধ্বনি। তাই কান্নার মৃদু স্পর্শ আছে মনে হয়। মানুষ নিজের ভাষা দিয়েই নিসর্গকে বুঝতে চায়।

ইন্দ্রের মনে ব্যাঘ্রবাহিনী দেবী-মূর্তিটি আবার ভেসে উঠল। তারপরই মনে পড়ল প্রজ্ঞা বলেছিল, যে শাস্ত্রে এক দেবীর নাম আছে : 'অরণ্যানী' এবং কথাটি তার বাবা ব্যঙ্গচ্ছলে বলেছেন। দেবী অরণ্যবাসী প্রাণীদের রক্ষা করতেন। শাস্ত্রীর মেয়ে শাস্ত্র জানবে, সংস্কৃতে জ্ঞানী হবে, এতে নতুন কিছু নেই। কিন্তু বসন্তের কৃষ্ণপক্ষে এই মধ্যরাতে অরণ্যানীই ইন্দরকে আবিষ্ট করলেন।

কাছিমের খোলের মতো উঁচু মাটিতে ঘনসংবদ্ধ বৃক্ষলতার ওপর টর্চের আলো ফেলতেই জ্বলজ্বলে দুটি নীল চোখ, ইন্দ্র মুহূর্তে রাইফেল তুলতে যাচ্ছিল। পরমুহূর্তে পিঠটানদেওয়া শেয়ালটির রূপাভাস তাকে সংযত করল। মাঝেমাঝে নিজের এই জৈব তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া টের পায় ইন্দ্র এবং বুঝতে পারে, তার দেহে কিছু প্রক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়া আছে, যেগুলি তার এক্তিয়ারবহির্ভূত। তার দেহের মধ্যে অন্য এক দেহ আছে। চন্দ্রবোড়া সাপটি সম্পর্কে সেই অন্যদেহই তাকে সজাগ করেছিল।

এ রাতে জঙ্গলটি এক নতুন জঙ্গল, নবাবিষ্কৃত। মাঝখানে কঠিন রুক্ষ কাঁকুরে মাটি থাকায় খোলামেলা একটি বৃত্তাকার কেন্দ্র আছে। সেখানে পৌঁছে টর্চ নেভাল সে। রাইফেলের বাঁট মাটিতে রেখে বাঁহাতের মুঠোয় নল ধরে পর্যায়ক্রমে চারদিকে দৃষ্টিপাত করতে থাকল। দৃষ্টিতে অন্বেষণ ও ব্যাকুলতা ছিল। দিনের দেখার সঙ্গে রাতের এই নিষ্প্রভ জ্যোৎস্নায় দেখা অভিজ্ঞতার তুলনাও ছিল। এখন গন্ধগুলিও খর হয়ে উঠেছে। অসহ্য সৌরভ। শুধু সৌরভ। মাথা খারাপ করে দেওয়া কী সুগন্ধ। জোরালো হাওয়ায় গাছপালা দুলছিল। শন শন, খসখস, খড় খড় বিবিধ ধ্বনি। অথচ কাশবনের মতো উদ্দেশ্যহীন নিসর্গধ্বনিমাত্র নয় ; নাকি ইন্দ্রও প্রজ্ঞার মতো অন্নদারানীর কণ্ঠস্বর শুনছে ? ইন্দ্র একটুভয় পেল। যেন এখনই দেবী সামনে এসে দাঁড়াবেন ! ধ্বনিগুলি বাড়ছে। জ্যোৎস্না আর ছায়া মিলেমিশে মুহুর্মুহু রূপবিভ্রম এদিকে-ওদিকে, সকলই নারীরূপাভাস। অরণ্যটি নারী-প্রতিভাসে আকীর্ণ হতে হতে এবং ধ্বনিগুলি মানুষের ভাষায় অর্থপূর্ণ হয়ে উঠতে উঠতে ইন্দ্র প্রচণ্ড ত্রাসে

বুদ্ধিভ্রংশ ; তার হাত থেকে টর্চ খসে পড়ল এবং রাইফেলের নল ঊর্ধ্বে আকাশমুখী করে সে হ্যামার টেনে ট্রিগারে চাপ দিল। বিকট ধাতব হুঙ্কার তছনছ করল স্বাভাবিকতাকে।

তারপর এক তুমুল আলোড়ন। জঙ্গল জুড়েঘুমন্ত পাখিদের চিৎকার, ওড়াউড়ি, আরও কিছু শব্দ। হনুমানের জঙ্গলটির হাঁকডাক, মাটিতে পায়ের দুদ্দাড় মচমচ। সাড়া পড়ে গেল। দেবী অরণ্যানীর ক্রুদ্ধ গর্জন চারদিকে। ইন্দ্রের আরও মাথাখারাপ হয়ে গেল। সৌন্দর্য আশা করেছিল, পেল বিভীষিকা।

পরদিন কাছারিবাড়িতে হাজার লোকের ভিড়। ঢোলসহরত করে ডেকে আনা। হুজুগের টান তো ছিলই। তবে জমিদার মা-বাপ। ডাকলে হুলুস্থুল পড়ে যায়। চারপাশের এলাকা থেকে আদিবাসীরাও এসেছিল। তাদের সঙ্গে স্ত্রীলোক, এটাই চোখে পড়ার মতো তফাত। তাদের আশা ছিল বোদো শা-র শুঁড়িখানায় হাঁড়িয়ার ঢালাও হুকুম দেওয়া হবে। কোনও সাড়া মিলল না এ ব্যাপারে। কিন্তু গোরা-গোরানীদর্শন একটা অভিজ্ঞতা। দুপুর নাগাদ পাইকসর্দার মেফুজ আর দেওয়ানবাবু চিন্তামণির সঙ্গে হাজার লোক রওনা দিয়েছিল। চিন্তামণির হাতে গাদা. বন্দুক। 'হাঁকা' ব্যাপারটা লোকেরা বোঝে। কারণ কতবার কত কালেকটার, সার্কেল অফিসার, পুলিশসুপার বাঘ শিকারে এসেছেন কুলখাড়ির জঙ্গল এলাকায়। তখন জঙ্গলও ছিল অনেক। বাঘও ছিল অনেক। 'রায়রায়ান'-আমলে হরিণ পর্যন্ত ছিল।

ক্লিনস্টোন সায়েবের হাতে সময় কম। নতুবা টোপ বেঁধে কোনও জঙ্গলে মাচানে বসতেন। বিশেষ কথা, 'স্মল টাইগা।' সামনে দাঁড়িয়ে মারবেন। তাঁর হাতে তথ্যছিল, এই জেলায় রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার নেই।

ধামশ, মাদল, ঢাক, ঢোল, টিন এবং লাঠি, বল্লম, টাঙ্গি, তীরধনুক, তলোয়ার অজস্র হাতে। কিন্তু কড়া নিষেধ, বাঘটিকে অক্ষত শরীরে গোরোসায়েবের গুলি খেতে দিতে হবে, যা মেমসায়েব দর্শন করবেন।

খানকির টাঁড়ের নীচে নালাটির নাম কেদারের নালা। কেদার কে ছিল তাই নিয়ে তর্ক আছে। একটি টাঁড়ের নামও কেদারের টাঁড়। সেও জঙ্গলে ঢেকে গেছে। ক্লিনস্টোন স-মেম সকালে চিন্তামণির সঙ্গে এক চক্কর ঘুরে এসেছেন। তাঁর নির্বাচিত স্থান কেদারের টাঁড়ের গা ঘেঁষে নালাটি যেখানে বাঁক দিয়েছে, সেখানে একটি লালমাটির ন্যাড়া ঢিবি। বাঘটিকে নালা দিয়ে আনতে হবে। কী পদ্ধতিতে আনা যাবে, নকশা এঁকে ক্লিনস্টোন বুঝিয়ে দিয়েছিলেন চিন্তামণিকে।

চিন্তামণি তারিফ করেছিলেন, সায়েবদের মাথা আছে বটে। তা না থাকলে পৃথিবীর সম্রাট হতে পারত না। হেডমাস্টার কালীনাথের উদ্দাত্ত কণ্ঠস্বরে কতবার শোনা গেছে, 'দা সান নেভার সেটস ইন দা ব্রিটিশ এম্পায়ার।'

চন্দ্রনাথ দোতলার ছাদে উঠে দেখতে গেলেন সব ঠিকঠাক চলছে কি না। তখনও কড়া রোদ। ছাদ থেকে পূর্বে বহুদূর দেখা যায়। তিষ্ঠোতে পারলেন না রোদে। দোতলার বারান্দায় বসে ফরসির নলে টান দিতে দিতে আপনমনে বললেন, 'ইন্দ্রনাথ? তাকে সকাল থেকে দেখছি না কেন?'

করুণাময়ী ঘরের মেঝেয় গম্ভীর মুখে বসে ছিলেন। সামনে পানের সুচিত্রিত উজ্জ্বল প্রকাণ্ড বাটা। রেকাবি। একটি বাজার। জবাব দিলেন না।

আশ্রিতা দূরসম্পর্কের আত্মীয়া ব্রজবালা মৃদুস্বরে বললেন, 'ভানু বলছিল, ছোটবাবু রাত্তিরে বাথানে গেছে। ঘোড়ায় চেপে।'

'ঘোড়ায় চেপে—বাথানে?' চন্দ্রনাথ একটু পরে ফের বললেন, 'বাঘ মারতে নাকি?'

ব্রজবালা ফোকলা মুখে হাসলেন। 'মারে তো মারুক, বাবা! বংশের জয়জয়াকার হবে। এইটুকুন বয়সেই তো মেরেছে। নতুন কী! মারুক।'

চন্দ্রনাথও হাসতে লাগলেন। 'সায়েবের কথায় আঁতে ঘা লেগেছে।'

চন্দ্রনাথের হাসি দেখে ব্রজবালা প্রতিবারের মতো কথাটি তোলার সুযোগ পেলেন। ছেলেকে আর কতকাল বিবাগী করে রাখবেন বাবা? যৌবনে পুরুষমানুষ কানা ঘোড়ার সওয়ার। সত্যি মিথ্যে যাই হোক না, অযথা কেলেংকারি রটে। বড়বাড়ি উঁচু জিনিস। লোকের চোখ পড়তে বাধা নেই। তবে আর লুকোছাপার প্রশ্ন ওঠে না। আগুন যদি ঘিয়ের কাছে এগিয়ে আসে, ঘি গলবে। এই যে বাঘ নিয়ে এত আয়োজন, সেই বাঘ যখন আহার করে, তখনও সেও আড়ালেই করে। প্রকাশ্যে দিনদুপুরে লাজলজ্জাহীন···ছিঃ!

চন্দ্রনাথ জানতে চাইলেন কার কথা বলা হচ্ছে। নেহাত কথার পিঠে কথা বলা!

ব্রজবালা চাপা স্বরে বললেন, বাপ পণ্ডিত হয়েও মেয়েকে 'ছোটলোক' করে রেখেছে। কে কবে দেখেছে, বামুনভদ্রলোকের মেয়েরা মাঠেঘাটে বনবাদাড়ে যায়। সমস্তটাই দিনে দিনে অসহ্য হয়ে উঠছে। পাঁচু পাইকের কাছে খবর নিলে জানা যাবে, একটা রহস্যময় কিছু ঘটছে। ইন্দ্রনাথ খানকির টাঁড়ে মাটি পত্তনি দিক, আবাদ করাক, বাপের মাটি। সেখানে পণ্ডিতের মেয়ে ফোঁপর দালালি করতে যায় কোন সাহসে?

এইসময় করুণাময়ী ঘরের ভেতর থেকে ঘোষণা করলেন, একটা ডাইনি তাঁর ছেলের মাথা খাবে, আর তিনি বরদাস্ত করতে পারবেন না। স্বামীর অপেক্ষায় ছিলেন। স্বামী যদি একটা ব্যবস্থা না করেন, তিনি মেফুজ-পাঁচুদের হুকুম দিয়ে ওই পণ্ডিতকে কাছারিবাড়ি থেকে বের করে দেবেন। তার মেয়ের মাথা ন্যাড়া করে দেবেন।

আরও অনেক কথাই বললেন করুণাময়ী। বলতে বলতে ক্লান্তি আসায় গাঢ় স্বরে এবং কান্নার চাপ গলায় রেখে শেষ বাক্য উচ্চারণ করলেন, 'আমাকে মা বলেও মনে করে না আর। পর করে দিল।'

চন্দ্রনাথ শুধু বললেন, 'দেখছি'। তারপর ঘরে ঢুকে পালঙ্কে উঠে চিত হলেন। ঘণ্টা দু-তিন দিবানিদ্রা এমনই মজ্জাগত অভ্যাস যে, প্রলয় ঘটলেও তিনি চোখ খুলবেন না বা জানতে চাইবেন না, কী হচ্ছে।...

ফটকের পেটা ঘড়িতে পাঁচটা বাজলে তবেই আজ কাছারি বন্ধ হল। জমিদারবাবু আছেন, তাই। না থাকলে চারবার ঘণ্টা বাজলেই কর্মচারীরা বেরিয়ে পড়েন সেরেস্তা থেকে। বছরের শেষ মাস বলে কাজের চাপ বেশি থাকে চৈত্রে। এই চাপ পয়লা আষাঢ় 'পুণ্যাহ' অনুষ্ঠান পর্যন্ত থাকে। সেদিন উৎসব। লোকারণ্য। যাত্রা, কীর্তন, কথকতা সারাটি রাত। সামিয়ানার তলায় মঞ্চ করে সিংহাসন পাতা হয়। চন্দ্রনাথ সিংহাসনে বসে থাকেন। পায়ের সামনে বিশাল সব চাঁদির রেকাব। তাতে প্রজাদের প্রণামীর স্তূপ। হিন্দু মুসলমানদের ভিন্ন ভিন্ন ভোজনব্যবস্থা। শেষে কাঙালিভোজন। তদুপরি খাজাঞ্চিখানা থেকে খাজনার রসিদ এনে দেখালে সন্দেশের ঠোঙা উপরি প্রাপ্য।

বিলিতি কেতায় কাছারির সময় বাঁধা হয়েছে চন্দ্রনাথের আমলে। তাঁর বাবার আমলে সকাল সাতটা থেকে বারোটা। একটা থেকে রাত সাতটা, আটটা, নটা···সময়ের মা-বাপ ছিল না। রাত এগারোটাতেও বাবু-মিয়ারা ঢুলে ঢুলে টাকা-আনা-পাইয়ের হিসাব মেলাতেন। টানা বারান্দায় দূর গাঁয়ের প্রজা চাষীরা ঘুমোত। এখন পাঁচটার পর সেরেস্তায় কাউকে কর্মরত দেখলে চন্দ্রনাথ বকে দেন। কর্মচারীরা কৃতজ্ঞ।

মজহারউদ্দিন ফটকের বাইরে গিয়ে দেখলেন, তাঁর ঘরের ওপাশে শুকনো পাতা ঝেঁটিয়ে জড়ো করছে পণ্ডিতের বেটি। কোমরে আঁচল জড়ানো। মজহারউদ্দিন কাছে গিয়ে কাশলেন, সে সোজা হল না। মজহরউদ্দিন বললেন, 'অ্যাইপাতাকুড়ুনি! আমি মানুষ না গাছ? হুঁ, জঙ্গল দেখে দেখে চোখে আর

মানুষ নজর হয় না। সবই গাছ। কিন্তু তুই নাকি আজকাল গাছেরও কথা শুনতে পাস ? হায়রে হায় ! পটে আঁকা অকাল-ভৈরবী ! কোনও-কোনও ওস্তাদের মতে, বিকেলেও ভৈরবী আসেন। বাধা নেই। মানতাম না। এখন মানলাম।'

এতগুলি কথার পর প্রজ্ঞা সোজা হল। ঠোঁটের কোণায় একটা ভাঁজ। হাসির প্রতিভাসমাত্র। দৃষ্টিতে কোনও ভাষা নেই।

'কবে না দেখি, ঘুঁটেও কুড়িয়ে বেড়াচ্ছিস আবাগীর বেটি !'

সত্যিকার হাসি ফুটল ঠোঁটে, কিন্তু বাঁকা। 'কুড়োই তো ! বামুনের মেয়ে গোবর ঘাঁটবে না ?' বলে ঝাঁটাটি হাঁটুর কাছে ঠেকা দিয়ে চুলবেঁধে নিল। খোঁপা খসে গিয়েছিল। 'বাবা যার পাঁচ সিকে মাইনে পায়, অথচ খাতায় সই করে পাঁচ টাকার, তার মেয়ে···'

থাপ্পড় তুলে মজহারউদ্দিন বললেন, 'তুই বাবার মেয়ে, না মায়ের মেয়ে ? তোর মরা মায়ের হয়ে থাপ্পড়টা আমিই দিই বরং !'

প্রজ্ঞা মুখ নামাল। একটু পরে বলল, 'যাই ! বাবা স্কুল থেকে আসবেন।'

মজহারউদ্দিন দু'পা এগিয়ে চাপা স্বরে বললেন, 'ইন্দ্রের খবর জানিস ?'

সাপিনী ফণা তুলল। ভ্রূ কুঞ্চিত। 'কেন ?'

'কাল দুপুররাতে নাকি ঘোড়ায় চেপে বাথানে গেছে। এখনও ফিরছে না কেন ?'

'জানি না।'

'জানিস।'

পাতাভর্তি ঝুড়িটা কাঁখে তুলে প্রজ্ঞা আস্তে বলল, 'কে কেন কোথায় গেছে, আমি অন্তর্যামী নই যে জানব। তবে····' ঢোক গিলে বলল, 'কাল সারারাত ঘুম হয়নি। সারারাত বিলের দিকে বন্দুকের শব্দ শুনেছি। কখনও দূরে, কখনও কাছে।'

'হুঁ, বোঝা গেল তা হলে !' বলে মজহারউদ্দিন পা বাড়ালেন।

এবার পেছনে প্রজ্ঞার উত্তেজিত কণ্ঠস্বর। 'কী বোঝা গেল, চাচা ? কী ?'

মজহারউদ্দিন জানালেন। 'সায়েবকে বাঘটা মারতে দেবে না। ভয় দেখিয়ে এলাকা ছাড়া করছিল। বাহাদুর ছেলে। সামনে পেলে দুই গালে চুমা খেতাম রে !'

'চাচা।'

মজহারউদ্দিন যেতে যেতে আবার ঘুরলেন। 'যদি মন খুলে কিছু বলতে চাস, বল। না হলে বলিসনে।'

'আমার কড্ড ভয় করছে। ও যেমন অবুঝ, তেমনি গোঁয়ার।'

'তোর চেয়ে ?'

প্রজ্ঞা ছটফট করে বলল, 'আমি অবুঝ নই, চাচা ! আমি যা করছি, জেনেশুনে করছি বা করি। কিন্তু ও জানে না কী করছে বা করে।'

মজহারউদ্দিন ওর চোখে চোখ রেখে বললেন, 'সব ফয়সালা তোর হাতে। বেলে সাপ নিয়ে খেলে। কথায় বলে, বেদের মরণ সাপের হাতে। তুই সাপ নিয়ে খেলছিস। সাবধান করে দিলাম।'

'আমি সাপ নিয়ে খেলছি, আমি জানি। কিন্তু কী করব ?'

'সাপটার বিষদাঁত ভেঙে দে !' মজহারউদ্দিন কৌতুকে বললেন। 'শিগগির ভেঙে দে !'

'তার মানে ?'

'এত বুঝিস। পণ্ডিতের মেয়ে তুই। এই সামান্য কথাটা বুঝিসনে ?'

প্রজ্ঞা দ্রুত চলে গেল। মজহারউদ্দিন একটু দাঁড়িয়ে থেকে নিজের ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। পণ্ডিতের মেয়ে কথাটি বুঝতে পেরেছে। ওভাবে চলে যাওয়ার এটাই অর্থ হয়।

দুধ-চিঁড়ে-বাতাসা খেয়ে দরজায় তালা এঁটে বেরুলেন মজহারউদ্দিন। নদীর বাঁধে কতক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকেও দিনমণিকে আসতে দেখলেন না। পূরবী ভাঁজতে থাকলেন ঘাসের ওপর বসে। তন্ময় হয়ে গুনগুন করছিলেন। সূর্য ডুবে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে বাঁদিকে দূরে নদীর বাঁকের মুখে এক ঘোড়সওয়ারকে দেখে তাকিয়ে রইলেন। নদীগর্ভে বালির ওপর দিয়ে আসছে ইন্দ্র। নৈসর্গিক পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য, এমন এক পটচিত্র।

এখানে নদীর সুচারু ঢাল। ইন্দ্র কাছাকাছি আসার আগেই নেমে গেলেন মজহারউদ্দিন। দাঁড়িয়ে রইলেন বালির চড়ার ওপর। ইন্দ্র এসে ঘোড়া থেকে নামল। তাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। কিন্তু মুখে হাসি এনে বলল, 'আদাব চাচা।'

'তুইতোকারি করব আজ। আগাম হুঁশিয়ারি দিলাম।' মজহারউদ্দিন ঈষৎ গম্ভীর হয়েই বললেন। 'জানিস তো ? তোদের কাছারির বাইরে আমি ওস্তাদ মজহারউদ্দিন খানসাহেব। বাপের বয়সীদেরও তুইতোকারি শালা-বাঞ্চোত করি।'

ইন্দ্র শুকনো হাসির সঙ্গে বলল, 'কথাটা কী ?'

'তোর দুই গালে দুটো চুমু খাব, বাপ ! আয়, কাছে আয়।' বলে নিজেই এগিয়ে গিয়ে কাজটি করলেন। ইন্দ্রের চেয়ে তিনি মাথায় উঁচু। বুকের ছাতি

দ্বিগুণ চওড়া। ইন্দ্রের মাথাটি দুহাতে ধরেছিলেন।

ইন্দ্র স্তম্ভিত। একটু পরে বলল, 'কেন চাচা?'

'জঙ্গলের বাঘ জঙ্গলের যে মালিক, তারই। গোরার হাতে তার জান যাওয়া না জাত যাওয়া? বল্ বাপ!' মজহারউদ্দিন উদাত্ত কণ্ঠস্বরে বললেন। 'শুনলাম, শালা বিলাত থেকে এ মুলুকে বাঘ মারতে এসেছে। আরও শুনলাম, সারারাত ও তল্লাটে বন্দুকের শব্দ শোনা গেছে। এদিকে গতরাত্রি থেকে তুই নাকি বাথানে। ছক্কা শালা বলল।'

'ওকে বলে গিয়েছিলাম।'

'তাহলে আঁক কষে কী দাঁড়ায়? মারলে তুই-ই মারবি। তোর সে হক আছে।'

ইন্দ্র আস্তে বলল, 'হয়তো নেই।'

'এ কী কথা?'

'দেবীর বাহন, চাচা! আপনি তো হিন্দুরও বাড়া। বুঝবেন।'

'তা হলে বুঝলাম। মজহারউদ্দিন হাসলেন। 'এও বুঝলাম, পণ্ডিতের বেটি যা দেখছে, তুইও তাই দেখতে পাচ্ছিস। আমার মুখ এখন অন্য মুখ। দোষঘাট নিবিনে, বাপ। অন্নদারানীকে কেউ বলত খানকি, কেউ বলত দেবী। ফি মঙ্গলবার ভর উঠত। জানিস একথা?'

'কুলখাড়ির লোকেদের কাছে শুনেছি।'

'পণ্ডিতের বেটি শুনেছে?' অদৃশ্য প্রজ্ঞার উদ্দেশ্যে আঙুল তুললেন মজহারউদ্দিন।

'শুনেছে। ওকে নিয়ে গিয়েছিলাম ওখানে। মায়ের কথা শুনতে চেয়েছিল।'

'তোদের শাস্ত্রে একটা গল্প আছে। অন্ধদের হাতি দেখা।'

'জানি গল্পটা।'

'সত্য জিনিসটা এমনি রে। যে-যেটুকু আঁচ করে। পুরোটা জানা যায় না— সে তুই যতই মাথা ভাঙ! তবে তোর মুখ থেকে দেবী কথাটা বেরুল, এটা পণ্ডিতের বেটির দেখা। তোর নিজের দেখাটা কী, চিন্তাভাবনা করিস।'

ইন্দ্র একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'কাল রাতে ওই জঙ্গলের ভেতর ঢুকেছিলাম। হঠাৎ ভীষণ ভয় পেলাম। যেদিকে তাকাই, মনে হয় একজন মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মাথা খারাপ হয়ে যাওয়ার উপক্রম। ভয়ের চোটে গুলি ছুঁড়লাম। তারপর সাহস ফিরে এল। তারপর চাচা, বিশ্বাস করুন, মনের ভেতর কেউ বলল, বাঘটাকে ভয় পাইয়ে এলাকাছাড়া করে দে। সারারাত এখান থেকে

সেখানে এলোপাথাড়ি গুলি ছুঁড়ে বেরিয়েছি।'

'তুই কী বলবি ? কিছুক্ষণ আগে পণ্ডিতের বেটিকে এই কথাটাই বলেছি।'

'কী বলল ?'

'বলল, বড্ড ভয় করছে। ও যেমন অবুঝ, তেমনি গোঁয়ার।'

'আমি না ও ?' ইন্দ্র বিষণ্ণ হাসল। 'ভয় কি আমারও করছে না ?'

মজহারউদ্দিন দুকানের লতি ছুঁয়ে বললেন, 'ওস্তাদজি একটা গল্প বলতেন। এক অন্ধের কাঁধে চেপে এক খঞ্জ চলেছে জঙ্গলের পথে। হঠাৎ কোথায় বাঘ ডাকল। খঞ্জ বলল, দেখো ভাই, যেন কাঁধ থেকে ফেলে দিয়ে পালিয়ে যেও না। বিপদে পড়ব। অন্ধও বলল, দেখো ভাই, যেন কাঁধ থেকে নেমে পালিও না। বিপদে পড়ব।'

তিনি চুপ করতে ইন্দ্র বলল, 'তারপর ?'

'তারপর আর কী ?' গল্পের এখানেই শেষ। বুঝে নে।'

ইন্দ্র চাপা শ্বাস ছেড়ে বলল, 'আপনি বড় হেঁয়ালি করেন !'

'জঙ্গলে বাঘ ডাকছে। অন্ধ কী করে পালাবে ? আর খঞ্জই বা কী করে পালাবে ? একজনের নেই পা, অন্যজনের নেই চোখ। দুজনে একত্র থাকলে তবেই তো পালাতে পারবে।'

ইন্দ্র এগিয়ে ঘোড়ার চোয়ালে হাত ঘষে আদর করতে থাকল।

মজহারউদ্দিন বললেন, 'অথচ দ্যাখ, অবুঝ মানুষের মন। পরস্পরকে ভয় করছে, সন্দেহ করছে।'

'বাবা কি ক্লিনস্টোন সায়েবকে নিছক বাঘ মারতে এনেছেন, নাকি এটা ছল, বুঝতে পারছি না। বাবা আমার কাছে বরাবর দূরের মানুষ। অচেনা লাগে। কাল সন্ধ্যায় মনে হল, লোকটা কে ?'

'অন্নদাবিবির টাঁড়ে লোক জড়ো করার দরকার কী ছিল ? পাঁচু পাইক রটাচ্ছে !'

'লোক জড়ো হচ্ছে, নিজেদের তাগিদে। মাটি ওদের কাছে সোনার চেয়ে দামি।'

'রটল কী করে যে জঙ্গল পত্তনি দেওয়া হবে ?'

'ওখানকার লোকের অনুমান। মাথা ভাঙছে।'

'কার কাছে ?'

ইন্দ্র একটু পরে বলল, 'প্রজ্ঞার ভুল। ওকে নিষেধ করেছিলাম। কিন্তু ও দিব্যি জানিয়ে দিল, আমি অন্নদারানীর মেয়ে। এ সম্পত্তি আমার।'

'সর্বনাশের সূচনা। ভাবল না কী লড়াইয়ে নামতে যাচ্ছে?'

'কুলখাড়ি এলাকার লোকেরা বলছে দেবীর জন্য রক্ত দেবে। অথচ ওরা মুসলমান।'

মজহারউদ্দিন বললেন, 'যা জানতাম, তা সত্যি প্রমাণিত হল। যা রটে, তা এত বেশি সত্যি হবে, আন্দাজ করিনি।'

'মনে হচ্ছে, এ সবের পেছনে বাবার শত্রুপক্ষের লোক আছে।'

'থাকবেই তো। এ সুযোগ কে ছাড়তে চাইবে?'

'আমি প্রজ্ঞার জন্য জীবন বাজি রাখতে চেয়েছিলাম। তাই আপনাকে দিয়ে সব উইল-দলিলপত্র হাতালাম। কিন্তু এইসব সম্ভাবনা ভাবিনি।'

'ওরে মুহব্বত মানুষকে অন্ধ করে। তোর দোষ কী?'

মুহব্বত শব্দটি যে-ভাবে উচ্চারিত হল, অথবা গায়কদের কণ্ঠস্বর কি কণ্ঠসাধনা এই নর-নারীসম্পর্কিত চিরকালীন আবেগ-প্রতীককে বহুমাত্রিক সুরঝংকারের অসংখ্য অর্থ দেয়, ইন্দ্র ধরা দিল। বলল, 'এখানেই গণ্ডগোল। জেনেশুনে ঠকছি। আমি কি এটুকু বুঝি না, পারু আমাকে তার ঘোড়া করেছে? হয়তো ওর মাও একইভাবে···দাদুকে

হাত তুলে মজহারউদ্দিন বললেন, 'ব্যস! ব্যস! একটু আগেই তোকে অন্ধদের হাতি দেখার কথাটা বললাম। তুই ঘোড়ার আণ্ডা বুঝলি!'

ইন্দ্র ঝিরঝিরে স্বচ্ছ জলস্রোতের কাছে গিয়ে ঝুঁকে মুখে জলের ছাঁট দিল। ভিজে মুখে উঠে এসে বলল, 'আপনি জ্ঞানী মানুষ। কেন বুঝতে পারছেন না আমাদের দুজনকার দুরকম মাটি দুরকম জঙ্গল?'

'বাঃ। তাহলে তো বোঝা গেল, তোর নিজের চোখ দুটো বহাল তবিয়তে আছে! মাঝেমাঝে সেই চোখেও দেখিস, যাচাই করিস।' মজহারউদ্দিন হাসলেন। 'কথাটা ফেরত নিলাম। তোর মহব্বতে একটুখানি খাদ আছে। তুই শিরি-ফরহাদের প্রেমকথা পড়েছিস? পড়িসনি ফরহাদ শিরির জন্য জান দিয়েছিল। তাও তো শিরি ছিল বাদশা খুশরুর বেগম। পরস্ত্রী। গল্পটা পরে একদিন শুনিস। এখন তুই পেরেসান। বাড়ি যা।'

'চলুন একসঙ্গে যাই।' বলে ইন্দ্র ঘোড়ার রাশটা হাতে নিল।

বাঁধে কিছুক্ষণ চুপচাপ হাঁটার পর মজহারউদ্দিন বললেন, 'খাঁটি প্রেম জিনিসটা সবসময় একতরফা। দুতরফা প্রেম মানেই প্রেমের পাঁঠার গর্দানে খাঁড়ার কোপ। খ্যাঁদা খ্যাঁদির জন্য আর খেঁদি খ্যাঁদার জন্য পিরীতে আকুল হলে হতেও পারে। কিন্তু এ পিরীত মেঠো জিনিস। দুনিয়াদারির আর পাঁচটা

জিনিসের মতোই। দুসরা কিসিমের পিরীত আছে, বাপ ইন্দ্রনাথ ! সে এক ভূত। ফরহাদ জান দিল। রাধিকাসুন্দরী বলল···

গুনগুন করে কীর্তনের সুরে গেয়ে উঠলেন গায়ক।

'না পোড়াইয়ো রাধাঅঙ্গ
না ভাসাইয়ো জলে।
মরিলে ঝুলাইয়ে রেখো
তমালেরই ডালে ॥'

গান শেষ হলে ইন্দ্র মুগ্ধভাবে বলল, 'মন ভরে গেল !'

'তুই হিঁদুর ছেলে। কালিদাসের মেঘদূত পড়েছিস ?'

'নাঃ ! আমি জংলি আকাট মুখ্যু।'

'পণ্ডিতের ঘরে খোঁজ নিস। পেয়ে যাবি।' মজহারউদ্দিন কানের লতি ছুঁয়ে বললেন। 'ওস্তাদজি বলতেন, যক্ষকে নির্বাসনে না পাঠালে মেঘদূত লেখা যেত না, লেখা যায় না। আর বাপ, রঙচঙে প্রজাপতি ফুলবাগিচায় ওড়ে। সে এক বাহার ! হাতে ধরে দ্যাখ, শালার ব্যাটা শালা একটা পোকা মাত্র !'····

কাছারিবাড়িতে আজ সন্ধ্যাতেও কালকের মতো আলোর জেললা। ছক্কা সহিস দৌড়ে এসে ইন্দ্রের ঘোড়ার রাশটা নিল। ইন্দ্র বলল, 'টহল খাওয়ানোর দরকার নেই। খেয়েছে। দানা খাওয়াও।'

ছক্কা জমিদারবাড়িতে ছক্কুমিয়া। খবর দিল, সায়েব-মেম খালি হাতে ফিরে এসেছে। বলছে, হয় হাঁকাওয়ালাদের দোষ, নয় তো বাঘের খবর মিথ্যা। অগত্যা শটগানে তাড়া খেয়ে বেরুনো একটা তিতির আর উড়ন্ত ঝাঁক থেকে দুটো হাঁস মেরে এনেছে। আগামীকাল সকালে জমিদারবাবুর মোটরগাড়ি সায়েব-মেমকে সদরে কালেক্টরের কুঠিতে পৌঁছে দিয়ে আসবে। শেষে গোঁফ চুলকে একটু হেসে সহিস বলে গেল, 'আপকা শের মারনেওয়ালা কৈ নেহি। মারে তো আপ মারে। ঔর কিসিকা তাকদ ?'

ইন্দ্র মনের ভেতর বলল, তারও সাধ্য কী ? দেবীর বাহন।

॥ ৪ ॥

গানের আখড়া থেকে শেষ লোকটি চলে যাওয়ার পর কাছারির ফটকে পেটাই ঘড়িতে ঢঙ করে একবার শব্দ হল। চৈত্ররাত্রে উতরোল হাওয়ার ভাটিতে

এই শব্দ। কিন্তু অভ্যাসে কানে এসে বাজে। মজহারউদ্দিন বদনা হাতে জৈব জলত্যাগের জন্য পেছনকার গাছতলায় গিয়ে বসেছিলেন। বসে থাকা অবস্থায় টের পেলেন তাঁর উঠোনে কেউ এসে দাঁড়াল। কাজটি শেষ করে দাঁড়ানোর পর বললেন, 'দেবীদর্শনের সঠিক সময় বটে!'

কৃষ্ণপক্ষের আতুর চাঁদটি তখনও ঘন গাছের আড়ালে। তার একটু আভা এদিকে-ওদিকে পড়েছে। কাছে গেলে প্রজ্ঞা তাঁর হাতে ন্যাকড়াটা লম্বাটে চারকোণা একটি জিনিস দিল। মজহারউদ্দিন শ্বাসের সঙ্গে বললেন, 'বাহান্ন বিঘে মাটি! মাথায় রাখি তো উকুনে খায়। হাতে রাখি তো হাত কাঁপে।'

প্রজ্ঞা নিঃশব্দে চলে গেল ছায়ার গভীরে। শ্বাসটি সশব্দে ছেড়ে গায়ক ঘরে ঢুকলেন। তোশকের তলায় জিনিসটি ঢুকিয়ে তক্তাপোসে বসে রইলেন। একটা কিছু ঘটতে চলেছে। আভাস পেয়েছে পণ্ডিতের বেটি।

কিন্তু পরের দিন কাছারিতে গিয়ে কোনও বৈলক্ষণ্য টের পেলেন না। যেমন চলছিল, তেমনি চলেছে সব কিছু। জমিদারবাবুর দর্শনার্থী প্রজাসাধারণের ভিড়টাই যা চোখে পড়ে। এ নতুন কিছু নয়। মোটরগাড়িটা নেই।

কিছুক্ষণ পরে প্রকাণ্ড জাবদা খতিয়ানবহি মুড়ে মজহারউদ্দিন বললেন, 'গোসাঁইদা, কালুডহরির বন্দোবস্তের কাগজপত্র?'

গোসাঁই হাই তুলে বললেন, 'চিন্তে জানে।' দেওয়ান চিন্তামণি সম্পর্কে নাকি ভাগনে। তবে সামনাসামনি চিন্তে বলেন না গোঁসাই। তুমি বলেন বটে!

'দেখি।' বলে মজহারউদ্দিন উঠলেন। খাজাঞ্চিখানার লাগোয়া দেওয়ানখানা। হাকিমের এজলাসের মতো কেতা আছে। একটি কাঠগড়াও বিদ্যমান। প্রজাকে আল্লা-পয়গম্বর এবং ভগবান-কালী-মহাদেব-কৃষ্ণ এঁদের নামে শপথ নিতে হয় যে প্রজা যাঁকে ভজে তাঁরনামে শপথ। তারপর বন্দোবস্তের খাতায় টিপছাপ। কাঠগড়ায় করজোড়ে দাঁড়িয়ে থাকার নিয়ম এবং বেরিয়ে আসার সময় প্রণাম বা আদাবও নিয়ম। বারান্দায় বেরিয়ে সেদিকে গেলেন না মজহারউদ্দিন। পামগাছের ছায়ায় দিনমণি দাঁড়িয়েছিলেন। তাঁর চোখের ব্যগ্র দৃষ্টি মজহারউদ্দিনকে বাইরে এনেছিল।

দিনমণি তাঁকে দেখামাত্র ফটকের দিকে হাঁটতে থাকলেন। মজহারউদ্দিন সংকেতটি বুঝলেন।

পিচরাস্তার ওধারে ঠাকরুনতলা। তালগাছে ঘেরা একটি পুকুর এবং বটগাছের ছায়ায় মাষষ্ঠী ঠাকরুণের জরাজীর্ণ মন্দির। বটগাছটির গোড়ায় জমাট লাইম কংক্রিটের চাঙড় পড়ে আছে। কোন যুগের প্রত্নিদর্শন। দিনমণি একটা

চাঙড়ে বসে ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন।

মজহারউদ্দিন একটু তফাতে বসে বললেন, 'কাল বিকেলে কোথায় যাওয়া হয়েছিল ?'

'বেরোইনি।'

'বল। দেরি করিস নে।'....

কিন্তু একটু দেরি করেই দিনমণি বললেন, কাল রাতে ইন্দ্র হঠাৎ গিয়ে কালিদাসের মেঘদূতম চাইল। তিনি বললেন, আছে তবে সংস্কৃত। ইন্দ্র সংস্কৃত জানলে নিয়ে যাক। ইন্দ্র বলল, হোক সংস্কৃত। জমিদারের আব্দেরে দুলাল। বাঘ মেরেছিল। বন্দুকবাজ। কাজেই দিতে হল। প্রজ্ঞা চুপ করে ছিল। কিন্তু তার মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন লক্ষ করেছিলেন দিনমণি। কিন্তু এটা কোনও গুরুতর ঘটনা নয়। ইন্দ্র চলে যাওয়ার কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রনাথের ডাক এল। চিন্তামণি নিয়ে গেলেন দিনমণি শাস্ত্রীকে। একেবারে অন্দরমহলের দোতলায় একটা ঘরে চন্দ্রনাথ বসে ছিলেন। ফরসিতে তামাক টানছিলেন। শেজবাতি জ্বলছিল। ঘর নীল সুগন্ধ ধোঁয়ায় ভরা। নেশা ধরে যায়।

দিনমণি পায়ের চটিতে একটা কাঠপিঁপড়ে পিষে মেরে বললেন, 'দম আটকে যাচ্ছে। পালাব।'

'পালাস। তারপর কী হল, বল্ না বে ?' মজহারউদ্দিন তেড়ে গেলেন।

দিনমণি গলার ভেতর বললেন, চিন্তামণি তাঁকে রেখে চলে গেলেন। চন্দ্রনাথ বসতে বললেন। তারপর স্কুলে সংস্কৃত পড়ানোর খুব প্রশংসা করলেন। হেডমাস্টারমশাইয়ের কাছে নিয়মিত খবরাখবর পান। এইসব ধানাই-পানাই করার পর বললেন, মেয়ের বিয়ে দিচ্ছেন না কেন। অসুবিধেটা কিসের, খুলে বললে ভাল হয়। সব খরচের দায়িত্ব তাঁর। যদি উপযুক্ত পাত্রের অভাববোধ করেন, মুখ ফুটে বলুন। তাঁর হাতে অনেক পাত্র আছে। শহরে চাইলে শহরে, গ্রামে চাইলে গ্রামে। ঘরে অরক্ষণীয়া মেয়ে থাকলে অযথা কলঙ্ক রটে। গ্রামের মানুষ তো নামেই মানুষ, দুপেয়ে জন্তুমাত্র। দুপেয়ে জন্তুকে অনেক সাধনায় মানুষ হতে হয়। সেই কথা ভেবেই স্কুলটা করে দিয়েছেন। এখনও মোট শদেড়েকের বেশি ছাত্র জোটেনি। মাটি আর মেয়ে মানুষ ছাড়া এরা আর কিছু বোঝে না।.....

'এতে ভয়ের কী আছে ? রাগেরই বা কী আছে ?'

'তুই সতেরআনা মোছলমান। আগুনঝাঁপ দিতেই তৈরি।'

মজহারউদ্দিন হাসলেন। 'ভুল বললি। আমি পাঠানবাচ্চা।-তাই আগুনঝাঁপ

দিতে তৈরি। আর তুই মারাঠাবাচ্চা। বর্গি! তাড়া খেলেই পালাতে তৈরি। কৈ, এ সওয়ালের জবাব দে!'

দিনমণি এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখার পর আগের কথায় ফিরলেন। চন্দ্রনাথ এত কথা বলছেন, আর তিনি চুপ করে আছেন। একসময় চন্দ্রনাথ তাঁর কথার উত্তর চাইলেন। দিনমণি বললেন, মেয়ে তাঁর অবাধ্য। তিনি এক্ষেত্রে অসহায়। বিয়ের কথা তুললে আত্মহত্যার ভয় দেখায়। একথা শোনার পর চন্দ্রনাথের একটি মুখোস খুলে গেল। বললেন, বাবা-মেয়ে যদি ইন্দ্রের আশা করে, সেটা খুব ভুল আশা হবে। দিনমণি দ্রুত বলেন, ছি ছি! একী কথা! তিনি এসব কথা কখনই চিন্তা করেন না। চন্দ্রনাথ শাসিয়ে বলেন, তাঁর মেয়ে নিশ্চয় আশা করে! মেয়েকে বাবা যেন কথাগুলি বুঝিয়ে দেন। দিনমণি চলে আসছেন, সেইসময় চন্দ্রনাথ তাঁকে ডাকেন। এবার চন্দ্রনাথের দ্বিতীয় মুখোস খুলে যায়। বলেন, তাঁর সন্দেহ হয়েছে, মেয়েটি পণ্ডিতমশাইয়ের ঔরসজাত কি না। তাঁর এও সন্দেহ, মেয়েটিকে নিয়ে পণ্ডিতমশাইরূপী অন্য কেউ বীরহাটায় খেলতে এসেছে। দিনমণি কিছু বলবেন ভাবছেন, সেইসময় চন্দ্রনাথের তৃতীয় মুখোস খুলে যায়। বলেন, খানকির টাঁড়ের জঙ্গলে প্রজা বসিয়ে তবে সদরে ফিরবেন। খানকির মেয়েকে পণ্ডিতমশাইরূপী লোকটি যেন বলে দেয়, তাঁর ছেলেকে দেহের মূল্য দিয়ে কেনা যায় না। হরনাথ আর ইন্দ্রনাথ দুই রকম মানুষ। চন্দ্রনাথ নিজের বাবা এবং নিজের ছেলেকে চিনবেন না, চিনবে উটকো কোনও ফন্দিবাজ এবং আরেক খানকি? এগুলি চতুর্থ, পঞ্চম এবং ষষ্ঠ মুখোস ছিল।

এই ঘটনার বিবরণ প্রজ্ঞাকে. একটু রেখেঢেকে দিয়েছেন দিনমণি। বাপ কোনমুখে চন্দ্রনাথের 'খানকি' কথাটির প্রতিধ্বনি করবেন?

'প্রজ্ঞা কী বলল?'

'নির্বিকার শুনল। শেষে বলল, ঠিক আছে। দেখা যাবে।'

'আমিও তাই বলছি। চুপ করে থাক।'

'স্কুলে যেতে পারলাম না। ভাবলাম...'

'প্রজ্ঞা কোথায়?'

'কিছুক্ষণ আগে বেরিয়ে গেল।' দিনমণির গলা ভেঙে গেল। 'বলে গেল, চুপচাপ বসে থাকি যেন। সে কুলখাড়ি যাচ্ছে।'

'হুঁ। ইন্দ্রকে দেখেছিস?'

'পারু বেরিয়ে যাওয়ার একটু পরে ইন্দ্র ঘোড়ায় চেপে গেল।'

'তা বলে মাথা খারাপ করছিস কেন?'

'আমাকে···ওই শূকর শাবক···' ফোঁস করে নাক ঝাড়লেন দিনমণি। কথা ফুরিয়ে গেছে। দৃষ্টিতে শূন্যতা।

মজহারউদ্দিন হাসলেন। 'চাঁদুশালার এক ভড়কিতেই কাছা খুলে গেল রে! ওর বাপ দেবী দেখেছিল। ওর ছেলে দেবী দেখেছে। এই আমিও দেবী দেখেছি! চাঁদু হারামজাদার জন্য দুঃখ হয়। পণ্ডিত! পাহাড় দেখেছিস তো? পাহাড় যে পাহাড়, তারও ধস ছাড়ে। রায়-রায়ানদের নাকি সতেরটা মহাল ছিল। এখন সাড়ে তিনটেতে ঠেকেছে। এর দেড়খানাও যায়-যায় অবস্থা। কালেক্টরের পায়ে দুবেলা তেল দেওয়ার জন্য আজকাল সদর ছাড়ে না। শহুরে বিবির জন্য নয়। কালেক্টরের দোস্ত-দোস্তানকে বাঘ ভেট দিতে পারেনি। মুষড়ে গেছে। তার ওপর এই উপদ্রব। কোণঠাসা শেয়ালের দাঁতখেঁচুনি। ডরাসনে।'

মজহারউদ্দিন চলে এলেন। দিনমণি বসে রইলেন।

দেওয়ানখানার বাইরে চিন্তামণির সামনে কয়েকজন কর্মচারীর জটলা। মজহারউদ্দিন দেখেও দেখলেন না। গোঁসাই তাঁকে দেখে বললেন, 'চিন্তেটা বরাবর এরকম। কালুডহরিতে বন্দোবস্তের কাগজপত্তরের কথা বলছিলেন? কোন কাগজ কোন থাকে যাবে, কোন মৌজার কোন তৌসিল, এসব খবর রাখে? মাধাই পণ্ডিতের পাঠশালার বিদ্যে। দেওয়ানজি হয়েছে।'

এটা মুন্সিয়ানা। গোসাঁই বাদে ঘর ফাঁকা। মজহারউদ্দিন বললেন, 'মাথা গরম কেন গোঁসাইদা?'

'খানসাহেব! আপনি গুণী সাধক পুরুষ।' গোঁসাই হঠাৎ চাপা স্বরে বললেন। 'কেন এই নরকে পড়ে আছেন, বুঝি না সেরেস্তায় ঢুকি আর গাঁয়ে আঁচ লাগে। বেরুলে সোয়াস্তি।

'আহা, গণ্ডগোলটা কী?'

গোঁসাই লোকটি এরকম। প্রশ্নের দিকে গেলেন না। আপন মনে গজগজ শুরু করলেন। 'হস্ত-বুদ্ খাতায় আগের সাল মাত্র একান্ন টাকা পাঁচ আনা তিন পয়সা দুই পাই গরমিল। এককড়ি চাটুয্যের নায়েবি গেল। ভেবে দেখুন! দারোগার হাতে তুলে দিলে। বামুনের ছেলে। শুদ্রের হাতে হেনস্থার একশেষ। এখন একলপ্তে বাহান্ন বিঘার কাগজ লোপাট। দেওয়ানি করছে!'

মজহারউদ্দিন নিমেষে সমস্তটা বুঝে গম্ভীর হলেন। নায়েবখানার কোথায় একটা কাঠের সিন্দুক আছে। তালা বন্ধ থাকে না। রায়-রায়ান আমল থেকে হরনাথের আমল পর্যন্ত কাগজপত্রের বাণ্ডিল টুকরো টুকরো তাঁতে বোনা শাদা গামছায় বেঁধে সিন্দুকে ঠাসা আছে। যেটা প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়, সেটার জন্য

লাল কাপড় বরাদ্দ। বাহান্ন বিঘে মাটির কাগজ প্রাসঙ্গিক বিবেচিত হয়নি। খানকির টাঁড়ের খানকি বড় বানের বছর ভেসে গেছে। তার নাকি দু-তিন বছরের একটি কন্যা ছিল। প্রায় দু' যুগ আগের কথা। দুর্গম বনেকান্তারে কী ঘটেছিল, তন্ন তন্ন কারও জানার কথা নয়। বানের তোড়ে মা ভেসে গেলে শিশুকন্যারও ভেসে যাওয়ার কথা। না চিন্তামণি, না তাঁর মালিক, কেউ ভাবতে পারেননি সব ঘটনারই ভিন্ন একটা দিক থাকে। এক ঘটনার সঙ্গে অন্য ঘটনাও জড়িত থাকে—আড়ালে।

সেই আড়ালের ঘটনা সময় মতো বড় ঘটনা হয়। বিশাল সৌধ বানায় মানুষ। একদিন হঠাৎ এক পাখি এসে নেদে যায় কার্নিশের কোনায়। তা থেকে মহীরুহ। সৌধ ফেটে ধুলিসাৎ হয়। নাদিতে কালবীক ছিল।

গোঁসাই কী ভেবে ফিক করে হেসে খানসাহেবের দিকে মুখ ঘোরালেন। চেহারা দেখে কেমন চমক জাগল। বললেন, 'শরীর খারাপ করছে নাকি, খানসাহেব ?'

'না গোঁসাইদা !'

গোঁসাই ফিসফিসিয়ে বললেন, 'খানকির টাঁড়ের কথা শুনেছেন ?'

'কেন দাদা ?'

এমন সময় তলব এল দেওয়ানবাবুর। মজহারউদ্দিন সবেগে উঠে গেলেন। চিন্তামণি তখন তাঁর হাকিমি এজলাসে। তক্তাপোসের ওপর চেয়ার-টেবিল। মুখে আগুন জ্বলছে। 'আদাব' শুনে প্রত্যুত্তর দিলেন না। খসখসে গলায় বললেন, 'আপনি এই সিন্দুক খুলেছিলেন ?' ডানহাতের তর্জনী সিন্দুকটির দিকে।

'সিন্দুক তো খোলাই দেখছি !'

'ওসব হেঁয়ালি সাগরেদদের কাছে করবেন না।' চিন্তামণি প্রায় গর্জন করলেন। 'আপনি গত বুধ কি বেস্যুতবার দুপুরে সিন্দুক খুলেছিলেন। সাক্ষী আছে।'

মজহারউদ্দিন শান্তভাবে বললেন, 'দরকার হলে মুন্সিখানার মুন্সিরা, এমন কি গোমস্তাবাবুরা বা নায়েববাবুও খোলেন। পুরনো পত্তনি নিয়ে মামলা বাধলে উকিলবাবুকে নথি দেওয়া হুকুম আছে। আপনারই ঢালাও হুকুম।'

চিন্তামণি ঈষৎ দমে গিয়ে বললেন, 'আপনি খুলেছিলেন বুধ কি বেস্যুতবার ?'

'খুলে থাকতে পারি। কালুডহরিতে নয়া বন্দোবস্তের আগে কী বন্দোবস্ত ছিল, দেখার দরকার ছিল। রায়ত মোকররবরি, না পাট্টা। পাট্টা হলে মৌরসি না

উঠবন্দি...'

চেয়ারে হলান দিয়ে চিন্তামণি বললেন, 'অত কথা শোনার সময় নেই। খানকির টাঁড়ের একটা নথি বাণ্ডিল বাঁধা ছিল। কোথায় গেল ?'

'লাল কাপড়ের বাণ্ডিলে কেউ হাত দেবে না।'

'লাল কাপড়ের বাণ্ডিল নয়।'

মজহারউদ্দিন হাসলেন। 'এ পাঠানবাচ্চাকে চোর ভাববার কারণ কী ?'

'পণ্ডিতের সঙ্গে গলাগলির জন্য।'

চিন্তামণির উত্তেজনা ক্রমশ থিতিয়ে ক্লান্তিতে নেমেছে। জোরে শ্বাস ছেড়ে টেবিলের ওপর ঝুঁকে এলেন। মজহারউদ্দিন বললেন, 'পণ্ডিতের সঙ্গে খানকির টাঁড়ের কী সম্পর্ক ?'

'আপনি গভীর জলের মাছ, খানসাহেব !'

'আপনার বঁড়সিতে টোপ নেই। খসে গেছে।'

চিন্তামণি একটু চুপচাপ থাকার পর বললেন, 'নায়েবমশাইকে কাগজপত্র বুঝিয়ে দিয়ে মাইনেকড়ি মিটিয়ে নিন গে খাজাঞ্চিখানায়।'

মজহারউদ্দিন আবার হাসলেন। 'আপনি আমাকে চাকরি দেননি। জমিদারবাবুর দস্তখত-করা কাগজ চাই।'

চিন্তামণি মুহূর্তে বদলে গেলেন। আগের চেয়ে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, 'দারোয়ানদের হুকুম দিচ্ছি, কাছারিবাড়ি ঢুকতে দেবে না আপনাকে। দেখি আপনার মুরোদ। ভেবেছেন, সারেগামা দিয়ে বীরহাটার মাথা কিনে ফেলেছেন। বীরহাটাকে আপনি চেনেন না। বাইরের লোক আপনি।'

মজহারউদ্দিন চলে আসছেন। পেছনে দেওয়ানবাবু পুনঃ জানিয়ে দিলেন, দরকার হলে থানার দারোগাবাবুকে লেলিয়ে দেবেন। দলিল চুরির দায়ে কোমরে দড়ি, হাতে হাতকড়া পড়বে।

অমনি মজহারউদ্দিন খান ঘুরে চাপা স্বরে বললেন, জমিদারবাবুকে দেওয়ানবাবু যেন এখনই জানিয়ে দেন, সেতাপগঞ্জের যে ছিটমহল উনি নিলামে কিনেছিলেন বলে দখল নেন, তার কাগজপত্র জাল। মকসুদা বেগম এখন লখনউতে বেঁচে আছেন। কোম্পানির আমলে জালিয়াতির দণ্ড ছিল ফাঁসি। এখন ইংলণ্ডের বাদশাহ ভারতবাসীকে পেনাল কোড উপহার দিয়েছেন। কিন্তু এতেও জালিয়াতির দণ্ড ফাঁসির বাড়া। ননীর শরীরে পাথর ভাঙা, ঘানি টানা সইবে কি না ভাবা দরকার। তদুপরি প্রায় সাত বছরের ন্যায্য প্রাপ্য বাবদ সুদসহ ক্ষতিপূরণ লক্ষাধিক টাকা দাঁড়াবে।

দেওয়ানবাবু শুধু খেঁকিয়ে উঠলেন, 'যান, যান !...'

নদীর দহের কাছাকাছি বালির চড়ায় একটি সুন্দর খেলা চলছিল তৎকালে। পাড়ে দুজন শিকারি আদিবাসী এবং জনাতিনেক চাষী হেসে কুটিকুটি হচ্ছিল। বাবুর ব্যাটা আর দেবীর বেটির মধ্যে এ কি পিরীতের খেলা, নাকি যা চোখে দেখছে সেটাই সত্য ?

ঘোড়ায় চড়া শিখছিল প্রজ্ঞা। জোরে ছোটাতে গিয়ে একবার বালিতে পড়ে গেল, উঠে দাঁড়িয়ে হাসতে লাগল। ইন্দ্র দৌড়ে গিয়ে বলল, 'চোট লাগেনি তো ?'

লাগেনি। ঘোড়াটা অপ্রস্তুত হয়ে আরও দূরে দাঁড়িয়ে গেছে চিত্রার্পিত। দুজনে এগিয়ে গেল তার কাছে। প্রজ্ঞা তার চোয়ালে ইন্দ্রের ভঙ্গিতে হাত ঘষে আদর করতে লাগল।

হিজলের জমাট ছায়ায় কুলখাড়ির ভাদু শেখ বলল, বেটির মায়ের কথা একটু-একটু মনে পড়ে তার। রাত্রে গাছে চড়ে উড়ে যেত কামরূপ-কামাখ্যার দেশে। ভোরবেলা ফিরে আসত। গাছটি সে চেনে। তবে কথা কী, আগের দিনকাল আর নেই। মা জানত গাছ চালানো বিদ্যা। বেটি শিখছে ঘোড়াচালানো বিদ্যা। যে কালের যা রীতি। অর্থাৎ দুনিয়া থেকে অলৌকিকতাগুলি খোদাতালা মানুষের হাত থেকে কেড়ে নিচ্ছেন ক্রমশ।

একথা শুনে আব্বাস আলি বলল, তার খালুর মাথা বিগড়ে গেছে। খানকি কথাটা উঠেছিল কেন ? খানকির পেটে খানকিই পয়দা হয়। চোখের সামনে এটা কী ঘটছে ?

ভাদু শেখ ভাইরাভায়ের যোয়ান ছেলের ঘেঁটি ধরে হাঁকরাল, আর একবার ওই কথা শুনলে ঘাড় মটকে নদীর তলায় পুঁতে ফেলবে।

কাঁচুমাচু হেসে আব্বাস আলি বলল, কথাটি কি তার নিজের ? বীরহাটার জোবেদ গোমস্তার।

শশ বাগদি তকলিতে জালের সুতো পাক দিতে দিতে বলল, মোছলমানের ছেলে কি জানে দুগ্গোমায়ের পুজোয় খানকির বাড়ির দোরগোড়ার মাটি লাগে ? হিঁদুর শাস্ত্র কেদারের টাঁড়ের জঙ্গল। গাছে-লতায় জটিল। ঢোকে কার বাবার সাধ্য ? এই যে তীরধনুকটাঙি হাতে বুনো মানুষগুলি বসে আছে, আব্বাস জিজ্ঞাসা করুক, কজন ওই জঙ্গলে ঢুকতে পেরেছে ? তারপর 'দেউড়' বাঁশের আদাড়। কোনও রকমে সরীসৃপের গম্য। শেয়ালগুলি আনাচেকানাচে ঘোরে

মাত্র। এই যে শশধর, বাগদিকুলে জন্ম। সে হাটবাজারে বাবুদের কাছে গিয়ে ওঠাবসা করে। শাস্ত্রের তল পায় না।

আব্বাস আলি দাঁত বের করে রইল। শশ নিরক্ষর জলমানুষ। কিন্তু হিন্দুর শাস্ত্র সত্যি জটিল, সে জানে। মুসলমান আল্লা ভজে। নবি তাঁর দরজা। নমাজ পড়লে সেই দরজা খোলে। কিন্তু হিঁদুর দরজা তেত্রিশ কোটি।

প্রজ্ঞা আবার ছুটেছে। ঘোড়াটি বাকের আড়ালে অদৃশ্য হলে ইন্দ্র অস্বস্তিতে পড়ে গেল। দেখার জন্য পাড়ে উঠে ভাদু শেখকে বলল, 'তুমি তো গাছে চড়তে পারবে না, চাচা ?'

ভাদু শেখ বলল, 'সব পারি। তবে ডর করবেন না। বেটির দিকে তার মায়ের নজর আছে।'

ইন্দ্র তত্ত্বকথায় বিরক্ত হয়ে আদিবাসী এক যুবককে বলল, ওই গাছে উঠে দেখুক ঘোড় সওয়ারের কী অবস্থা। আদিবাসী যুবকটি গাছে চড়তে যাচ্ছে, ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল বালি উড়িয়ে ফিরে আসছে। ঝুঁকে পড়েছে ঘোড়ার গ্রীবায় এবং দুহাতে গ্রীবা আঁকড়ে ধরেছে। ইন্দ্র দৌড়ে নেমে গিয়ে পা শূন্যে উঠেছিল, হ্রেষাধ্বনিও শোনা গেল, কিন্তু এবার প্রজ্ঞা আড় খেল না। গ্রীবা আঁকড়ে থাকার জন্য। চকিতে ইন্দ্রের মনে লালসা কি কামভাব জেগেছিল, সে যদি ওই অশ্ব হত !

আত্মসম্বরণ করে কাছে গেল সে। গায়ক খানসাহেবের মুহব্বত-তত্ত্বটি স্মরণ হয়েছিল।

প্রজ্ঞা বলল, 'হাঁপ ধরে গেছে ! ওঃ !' সে হাঁপাচ্ছিল। পুনঃ বলল, 'নামান।'

'রেকাবে পা। নামতে অসুবিধে কী ?'

'আমাকে ছুঁলে জাত যাবে না। ধরুন।'

ইন্দ্র চাপা স্বরে বলল, 'ছুঁতে পেলে ধন্য হই। কিন্তু ওরা কেচ্ছা রটাবে।'

প্রজ্ঞা রেকাবে পা আটকে যাওয়ার ভয়ে লাফ দিয়ে নামল। আছাড় খেল আগের মতো। পাড়ে লোকগুলোর দাঁত ছায়ার ভেতর ঝকঝক করতে থাকল। তারা বন্যগুল্মের মতো দুলে-দুলে হাসছিল।

প্রজ্ঞা শাড়ি ঝেড়ে বালি পরিষ্কার করে আস্তে বলল, 'কে কাকে ধন্য করে ?'

ইন্দ্র বুঝতে না পেরে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিল, প্রজ্ঞা পাড়ে উঠতে থাকল। ভাদু শেখকে চিনতে পেরে বলল, 'চাচা, কথা আছে। গাঁয়ে চলুন !'

ভাদু শেখ করযোড়ে বলল, 'মা জননী ! পুত্রসন্তানকে আপনি বললে মনে বাজে।'

প্রজ্ঞা হাসল। তারপর ঘুরে নদীগর্ভে ইন্দ্রের দিকে তাকাল। ইন্দ্র ঘোড়ার রাশ হাতে দাঁড়িয়ে ছিল। 'কী হল ইন্দ্রবাবু ? আসবেন না ?' বলে প্রজ্ঞা দুই চোখ থেকে রশ্মি বিকিরণ করল।

ইন্দ্র রশ্মিপাতে জর্জরিত হয়ে উঠে এল। ঘোড়াটিও চমৎকার উঠল তার পেছন-পেছন। ভাদু শেখ তার ভাইরাভায়ের ছেলেকে হুকুম দিচ্ছিল, গাঁয় খবর দিক। একটু দৌড়ে যেতে হবে। আব্বাস আলি হাঁটতে থাকল বটে, কিন্তু তার গতিটি পছন্দ হল না খালুর। এমন কি শশও মন্তব্য করল, ছেলেটা হালচষা বলদ। তখন ভাদু শেখ বলল, 'এস মিতে ! আমরা এগোই। মাজননী আস্তেসুস্থে আসুন। কেলান্ত মালুম হচ্ছে।' ইন্দ্রকে সে 'বাবুর ব্যাটা'-র বদলে স্নেহবশে আজ সম্ভাষণ করল, 'বাপজান ! ইনি বিদ্যেধরীর বেটি। বেশি কী বলি ? আপনারা ইচ্ছেমতো আসুন গো ! রোজ কেয়ামতের (মহাপ্রলয়ের দিন) এখনও অনেক দেরি।'

সে এবং শশ ধুকুর ধুকুর দৌড়তে থাকল। এই দৌড়টি বন্যতাময়। ইন্দ্র আদিবাসীদের উদ্দেশে বলল, তারাও কুলখাড়ি যেতে পারে। এতে তাদের লাভ হবে। কিন্তু সাবধান, মাইজির ওই জঙ্গলে যেন ঢোকে না।

তারা পাষাণ ভাস্কর্য হয়ে রইল।

ইন্দ্র পুনঃ উষ্ণভাবে বলল, তারা কি কথাটি বুঝতে পেরেছে ? মাইজির জঙ্গলে জীবহত্যা নিষিদ্ধ। মুখে রক্ত উঠে মারা পড়বে।

দলের বুড়ো লোকটি এবার নদীর ওপার দেখিয়ে বলল, তারা ওপারে যাবে।

একটু পরে বাঁধের পথে আগে প্রজ্ঞা, পেছনে রাশ হাতে ইন্দ্র, তার পেছনে ঘোড়াটি হাঁটছিল। তখন প্রজ্ঞা বলল, 'মাইজির টাঁড় বললেন কেন ইন্দ্রবাবু ?'

'সে-ব্যাখ্যা জানতে হলে বিহারী গয়লাদের বাথানে যেতে হবে। বরং ফেরার পথে যাব।'

প্রজ্ঞা অন্যমনস্কভাবে বলল, 'যাব। কিন্তু বাবার জন্য একটু ভাবনা হচ্ছে।'

'মজহারচাচা আছেন।' ইন্দ্র এই বাক্যে আরও শক্তি দিতে পুনঃ বলল, 'মানুষটি অসাধারণ।'

বাঁধটি কোথাও নিচু, কোথাও উঁচু। ভূপ্রকৃতির বিন্যাস সুসম নয়। তাছাড়া মানুষের খেয়ালও একটি কারণ। কোনও বিজ্ঞ প্রযুক্তিবিদের তদারক এবং নকশা অনুসারে নির্মিত হয়নি। আদিমস্বভাবী মানুষগুলির লড়াকু প্রবৃত্তির আঁকাবাঁকা সর্পিল স্বাক্ষর। আরও বোঝা যায়, তারা বৃক্ষের শক্তি-সামর্থ সম্পর্কে বংশপরম্পরা সচেতন, যেকারণে বাঁধের দুই পিঠে বৃক্ষগুলিকে স্বেচ্ছাচারী হতে

দিয়েছে। গাঢ় ছায়ায় হাঁটতে হাঁটতে, সামনে প্রিয়তমা নারী, ইন্দ্র ক্রমে চাপা উত্তেজনায় আক্রান্ত এবং মুহুর্মুহু কামনা বা লালসা তার শরীরকে নিয়ে খেলতে শুরু করেছিল। চারদিকে অবাধ নির্জনতা স্বাধীনতা হয়ে আছে! কিন্তু প্রজ্ঞা সহসা ঘুরে বলল, 'আপনি কখনও হিমালয়ে গেছেন? হরিদ্বার? যোশীমঠ? বদরিকাশ্রম? অমরনাথ?'

অপ্রস্তুত ইন্দ্র বলল, 'না। কেন?'

প্রজ্ঞা একটু হাসল। 'বাবা পাণ্ডাগিরি করতেন। মেয়েকে কার কাছে রেখে একা যাবেন? হিমালয় ঘোরা হয়ে গেল। তবে প্রথম ঘোড়ায় চাপি অমরনাথ যেতে। এক শেঠজি ঘোড়া ভাড়া করেছিলেন। ডেকে বললেন, বেটি! আমার ধরমনশে হচ্ছে। ছোটি লড়কি তু। সেই প্রথম ঘোড়ায় চাপা। তারপর তো কোমরে ব্যথার চোটে অস্থির। হিমালয় এলাকার ঘোড়াগুলো ছোট। খচ্চর, গাধা এসবও দেখেছি। নেশায় পেয়েছিল। পুর্ণিয়া এলাকায় থাকার সময় বাবার একটা ঘোড়া ছিল। লোকে বলত শাস্ত্রীজিকা টাট্টু। বাবা বলেছিলেন, তোর মা ঘোড়ায় চেপে তলোয়ার হাতে গোরা সিপাহিদের সঙ্গে যুদ্ধ করেছিল। বাবার চোখে দুষ্টুমি ছিল। কিন্তু সত্যি মিথ্যে যাই হোক, সেইটে পটে আঁকা ছবি হয়ে গেছে। মজহারচাচা কালই বলছিলেন, তুই বাবার নোস, মায়ের বেটি। আপনি ঠিক বলেছেন ইন্দ্রবাবু! মানুষটি অসাধারণ।'

এতগুলি কথার পর ইন্দ্র একটু ধাঁধায় পড়েছিল। সে চুপচাপ হাঁটল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আমার খুব অবাক লাগছিল। এতক্ষণে বুঝলাম।'

'কী বুঝলেন বলুন তো?'

'আপনি ঘোড়া বোঝেন।'

'বুঝি খানিকটা। তবে আপনার ঘোড়াটি সত্যিকার ঘোড়া।' প্রজ্ঞা বালিকার কৌতূহলে প্রশ্ন করল, 'অনেক টাকা দাম না?'

'মদনপুর ঘোড়হাটা থেকে কিনে এনেছি। দু বছর আগে।' ইন্দ্র ঘোড়ার চোয়ালে একটা হাত রেখে হাঁটতে থাকল। 'আসলে ঠাকুর্দার আমলে দুটো ঘোড়া ছিল। ময়ুরপঙ্খি গড়নের টমটম টানত। ছক্কামিয়ার সে আমলে খুব রবরবা। তারপর টমটম ফেলে ঘোড়া চলে গেল পরলোকে। কোচোয়ান টমটমের অভাবে কাছারির হুঁকোবরদার হয়ে কাটাচ্ছিল। কী করি? ঘোড়ারোগে পেল। মন্ত্রটা অবশ্য ছক্কারই। সে সব সময় আমাকে তাতাত। রায়বায়ান-রাজা-জমিদারের ছেলে। সে ঘোড়ায় না চাপলে ইজ্জত থাকে?' ইন্দ্র হাসতে লাগল। 'ছক্কা বলত, মোটরগাড়ি? ধুর ধুর! কলকব্জার কি প্রাণ আছে

যে চালকের মর্জি বুঝবে, মনের সুখ-দুঃখ বুঝবে ? কথাগুলো যে কত সত্য, এই দু বছরে বুঝে গেছি। বললে বিশ্বাস করবেন না, বাচ্চু আমার দুঃখও টের পায়। বাচ্চু আমারই একটা অচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে।'

'বাচ্চু ! এর নাম বাচ্চু, ধুস !'

'ছক্কার দেওয়া নাম। কিন্তু আমার তো খারাপ লাগে না !'

'আপনার নাম যদি ইন্দ্র হয়, আপনার অশ্বের নাম হবে উচ্চৈঃ শ্রবাঃ।'

ইন্দ্র জোরে হেসে উঠল। জীবনে এই হাসি সে কখনও হেসেছে কি ? বলল, 'মুখ দিয়ে বেরুবে না।'

'ওঃ ! আপনি ইন্দ্রনাথ। ইন্দ্রঃ নাথঃ যস্য স। ইন্দ্রের ভৃত্য ! ইন্দ্রজিৎ নন কেন ?'

ইন্দ্র হাসতে লাগল। 'জঙ্গলে একটা টোল খুলে বসুন। আর মেঘদূতম পড়ান আমাকে।'

প্রজ্ঞার মুখে বিস্ময় এল। 'হঠাৎ কাল সন্ধ্যায় বাবার কাছে মেঘদূত চাইতে এলেন কেন ?'

'ওই তো বললাম, আপনি পড়াবেন জঙ্গলের টোলে।' ইন্দ্র স্বভাবত ভুল উচ্চারণে আবৃত্তি করল :

'কশ্চিৎ কান্তাবিরহগুরুণা স্বাধিকারপ্রমত্তঃ
শাপেনাস্তংগমিতমহিমা বর্ষভোগ্যেণ ভর্তুঃ।
যক্ষশ্চক্রে জনকতনয়াস্নানপুণ্যোদকেষু
স্নিগ্ধাচ্ছায়াতরুষু বসতিং...'

প্রজ্ঞা গম্ভীর হয়ে বলল, 'থাক্। কাল রাত জেগে মুখস্থ করেছেন। দেবনাগরী অক্ষরও পড়তে পারেন তা হলে !'

'মিথ্যা বলা পাপ। যশো গোঁসাই কে চেনেন ? সেরেস্তার কর্মচারী। গোটা আষ্টেক শ্লোক বাংলায় লিখে মানে সুদ্ধু করে নিয়ে গেলাম। যশো গোঁসাইজ্যাঠা একটা আধুলি প্রণামী পেয়ে খুশি। ক্রমে ক্রমে পুরো কাজটি শেষ করে দেবেন।'

'এ খেয়াল কেন ইন্দ্রবাবু ?'

'আপনি গাছের সঙ্গে কথা বলেন। গাছ আপনার সঙ্গে কথা বলে। আমি মেঘের সঙ্গে কথা বলতে চাই। মেঘও আমার সঙ্গে কথা বলুক।'

কিছুক্ষণ কয়েকটা বাঁক চুপচাপ পেরিয়ে গেল দুজনে। রাত্রে ইন্দ্রের দেখা সেই চন্দ্রবোড়া সাপের মতো এঁকে বেঁকে এই নদী ছটফটিয়ে পালাচ্ছে ! হঠাৎ প্রজ্ঞা ডাকল, 'ইন্দ্র !'

কণ্ঠস্বরটি কোমল ছিল। ইন্দ্র ঈষৎ শিহরিত। আস্তে বলল, 'কী ?'

'নিজেকে নির্বাসিত ভাবছ কেন ?'

অতর্কিত এই সম্ভাষণ ও বাক্যে ইন্দ্রের শিহরণ ঘটেছিল শরীরে এবং মনে। একটু পরে উত্তেজনা দমন করে বলল, 'কেউ কী, নিজেকে কতকটা বোঝে, কতকটা বোঝে না। বুঝলেও ভাবে, তা কেন ? আমি অমনটি নই। এভাবে দিন যায়। সে-মানুষ বুড়ো হয়ে মরেও যায়। কিন্তু হঠাৎ কোনও দিন কেউ চোখে আঙুল দিয়ে যদি দেখিয়ে দেয়, তুই হচ্ছিস এরকম—অমনি সবটা পরিষ্কার হয়ে যায়।'

'কে দেখিয়ে দিল ? মজহারচাচা তো ?' প্রজ্ঞা কপট ঝাঁঝে বলল।

ইন্দ্র হাসবার চেষ্টা করল। তার বুকের ভেতর কী এক চাপ, ভয়াবহ আবেগ। কিন্তু নিজেকে দমন করার শক্তি তার আছে। 'আমাকে সাহস দাও, যাতে তোমাকে তুমি বলতে পারি। দ্বিধায় উচ্চারণ করল সে।

'বলছ না কি ?' প্রজ্ঞা নিঃশব্দে হাসল। "আসলে আমি বরাবর একটু স্বার্থপর, জানো ? কাল রাত থেকে ভেবে-ভেবে ঠিক করেছি, আমাদের এবার কাছাকাছি হওয়ার সময় এসে গেছে।'

কথাগুলি সে অনায়াসে বলল, যে গতিতে জলে স্রোত বয়। প্রান্তর মুক্তি হয়ে ওঠে। সর্বত্র একটা ব্যাপ্ত স্বাচ্ছন্দ্য ফোটে। ইন্দ্র তাই ঈষৎ আবেগপূর্ণ কৌতুকে বলল, 'কতখানি কাছাকাছি ?'

প্রজ্ঞা ভ্রূ কুঞ্চিত করে শব্দহীন সুদৃশ্য হেসে মুখটা একবার ঘুরিয়ে বলল, 'হাতে গজকাঠি নিয়ে মেপে দেখো।'

সেইময় নদীর পাড়ে ওপারে ভিড় দেখা গেল। সকল বয়সী পুরুষ-স্ত্রীলোক জড়ো হয়েছে। ইন্দ্র দৃশ্যটি দেখে বলল, 'একটা কথা তোমাকে বলা দরকার। আগে যে-ভাবে বলেছি, সে-ভাবে নয়। অন্যভাবে।'

'কী কথা ?'

'ওরা যদি টের পায়, তুমি ওদের ঠকাচ্ছ...'

প্রজ্ঞা ফুঁসে উঠল। 'ঠকাব কেন ? আমাকে কী ভাবছ তুমি ?'

'রাগ কোরো না। আমি ছোটবেলা থেকে ওদের চিনি।'

'ঠকানোর কথা উঠছে কেন ?'

'তুমি তোমার জঙ্গলে আবাদ করতে দিতে চাও না বলেছিলে।'

প্রজ্ঞা আস্তে বলল, 'গত রাতে মা বলল, আমাকে বাঁচা। আমি জানতে চাইলাম, কীভাবে ? মা বলল, যেভাবে পারিস।'

ইন্দ্র বলতে যাচ্ছিল, প্রজ্ঞাকে ভূতে পেয়েছে, অথবা তার মাথায় ছিট আছে প্রমাণ পাওয়া গেল। কিন্তু কৌতুক চেপে কপট গাম্ভীর্যে বলল, 'কিছু ভেবেচিন্তে নিয়েছ তা হলে ?'

'না ভেবে রাখলে এলাম কেন ? কেন ভাদুচাচাকে আভাসে বললাম লোক ডাকতে ?'

ইন্দ্র চুপ করে গেল। নদীগর্ভে নেমে শুকনো চড়ার প্রান্ত ঘেঁষে এক ফালি জলস্রোতের সামনে সে থমকে দাঁড়িয়ে যখন ভাবছে, জুতো ভেজানোর বদলে ঘোড়ার পিঠে চেপে জলটা পেরিয়ে যাবে এবং প্রজ্ঞার অসুবিধে নেই, যেহেতু তার খালি পা, তখন পাড়ের মাথায় শাদা চুলদাড়িওয়ালা এক বৃদ্ধ মুসলমান চেঁচিয়ে উঠেছিল, 'ওরে বাছারা ! দ্যাখ, দ্যাখ ! একই আসমানে একই সঙ্গে চাঁদসুরুজ দ্যাখ্ !' দ্রুত ইন্দ্র প্রজ্ঞার দিকে তাকিয়ে দেখেছিল কুণ্ঠিতা যুবতীর কমনীয় লজ্জা, এতদিনে এই প্রথম। কিন্তু অতি ক্ষণস্থায়ী।...

ভগবানদাস পাটোয়ারির গদি নদীর ঘাটের মাথায় উত্তুঙ্গ মাটিতে। সব মাটিই ঐতিহাসিক। মজহারউদ্দিন গদিতে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে বসে সত্য-মিথ্যামিশ্রিত ইতিহাসের দু' চার পাতা উল্টে বলছিলেন, তাঁর মামুজির লেখা ফার্সি পাণ্ডুলিপিতে এ মাটির অনেক খবর লেখা আছে। পাটোয়ারিজির ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার নাম অর্জুনদাস। মুখসুদাবাদ রিয়াসত থেকে পাট্টা পেয়ে বীরহাটায় পৌঁছে দেখেন, নদীর পাড়ে টিবির মাথায় বট। তার তলায় চটি বানালেন। সেই বটের মহিমা ছাড়া কী ? মুচকি হেসে ইচ্ছাকৃত চাপা স্বরে পুনঃ বললেন, এ মাটি খুঁড়লে স্বয়ং মহাবীরজির মন্দিরের পাথর বেরুতে পারে। এটি জৈনসংস্কারে তোল্লাই।

তোল্লাইসূত্রে গর্বিত ভগবানদাস বললেন, মুখসুদাবাদের শেঠদের সঙ্গে তাঁদের দ্বন্দ্ব ছিল। সেই দ্বন্দ্বের বিস্তারিত বিবরণ মাঝামাঝি থামিয়ে মজহারউদ্দিন লম্বাটে চৌকো নতুন তাঁতের গামছায় বাঁধা একটি জিনিস চালান করে দিলেন তাঁর হাতে। ভগবানদাস ঈষৎ চমকে উঠেছিলেন। সামলে নিয়ে চোখের ভাষায় বললেন, কী ? মজহারউদ্দিন একটু হাসলেন। মৃদুস্বরে বললেন, পরগণার অসংখ্য লোকের অসংখ্য দামি জিনিসের যিনি জিম্মাদার, তাঁর হেফাজত লোহার সিন্দুকের চেয়ে মজবুত। নবাব সিরাজুদ্দৌলা তাঁর খালাজানের লোহার সিন্দুকের ওপর একশ তোপের গোলা মেরেছিলেন। সেই সিন্দুক যা ছিল, তাই থেকে গেল। ক্লাইভ বিলাত শহরে নিয়ে গিয়ে বিলিতি যন্ত্রে ভেদ করেন।

ইংরেজের হিকমত। তাই হিন্দুস্তান তাঁবে করেছে। আরও বলার কথা, সিরাজুদ্দৌলার খালাজানের নাম ছিল ঘিয়াসাতি বেগম। শালা ইংরেজ লোকের মুখ! বেগম সাহেবাকে 'ঘসেটি' বানিয়ে ছেড়েছে!

তবে, না না! বন্ধকী মাল নয়। স্রেফ জিম্মাদারির ব্যাপার। মজহারউদ্দিন কিঞ্চিৎ আভাসও দিলেন। জমিদারবাবুর নামে পাটোয়ারি খাতায় যে-দেনার অঙ্ক মাস-মাস ছানাপোনা ছেড়ে ঝাঁক বাড়াচ্ছে, অথচ পাই-পয়সা উসুল হচ্ছে না, আর পাটোয়ারিজি আদালতের দিকেও পা বাড়াতে সাহস পাচ্ছেন না, সেই সাহস জিম্মা রইল। মহাজনী কারবার যাঁর, তাঁর সামনে এটি টোপ।

পাটোয়ারিজি জিনিসটি লোহার সিন্দুকে রেখে এসে নিজস্ব লালটিনবাতির দম কমিয়ে দিলেন। কী একটা কথা ভেবে বললেন, 'তো ঠিক হ্যায়!' তারপর শুকনো হাসি হাসলেন। বাইরে অন্ধকার। খাটিয়ায় পাহারাদাররা খৈনি ডলছে। গদির ভেতর তিন তাগড়াই ছেলে একত্র বসে কারবার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ আলোচনায় লিপ্ত। পাটোয়ারিজি খানসাহেবকে বিদায় দিতে বাইরে বেরিয়েছিলেন। বটতলা জুড়ে দূরাঞ্চলের গোরুমোষের গাড়ি এবং প্রাণীগুলি জাবনা খাচ্ছে। গাড়োয়ানরা শস্য বিক্রেতা। একটু পরে রওনা দেবে। পাটোয়ারিজি তাদের প্রতিও বিদায় সম্ভাষণের কাজে গেলেন। এটি চিরাচরিত প্রথা। সুচারু আনুষ্ঠানিক পদ্ধতি আছে।...

মজহারউদ্দিন একটু দূর থেকে লক্ষ করছিলেন, তাঁর আখড়া আপন রঙ্গে মশগুল। রামহরি চাটুয্যে এস্রাজের সঙ্গে বাগেশ্রী গাইছেন। গুনু তেতালে ঠেকা দিচ্ছে তবলায়। বারান্দায় শ্রোতার ভিড়।

আখড়ার দিকে ঘুরতেই গায়ে চিরিকবাত্তির আলো পড়ল। মজহারউদ্দিন বললেন, 'ইন্দ্র?'

'না, খানসাহেব!' এবং একটু পরে, 'আপনার জন্য দাঁড়িয়ে আছি। খবর নিয়ে জানলাম...'

'চৌধুরীমশাই? আদব, আদব!' মজহারউদ্দিন একটু হাসলেন। 'তলব দিলেই বান্দা হুকুম হাজির হত।'

চন্দ্রনাথ অনুচ্চ স্বরে বললেন, 'আমি দুঃখিত। চিন্তে হারামজাদাকে কী বলি, কী বোঝে!'

'আমি বহতা নদী, চৌধুরি মশাই! পানিতে দাগ কাটা যায় না।'

'আপনি আসুন। সব বুঝিয়ে বলছি।'

'পণ্ডিতমশাইকেও দরকার ছিল, চৌধুরিমশাই!'

'তাঁর পাত্তা নেই। তাঁর মেয়েরও পাত্তা নেই। ঘরের দরজায় তালা ঝুলছে।' চন্দ্রনাথ পা বাড়িয়ে বললেন, 'আপনি জানেন কি না জানি না, আমি ওঁদের উচ্ছেদ করিনি।'

'ইন্দ্রবাবাজি আছে কি?'

চন্দ্রনাথ ফটকের কাছে গিয়ে তিক্তস্বরে বললেন, 'বাথানে আছে খবর পেলাম।'...

॥ ৫ ॥

সেরাতে মজহারউদ্দিন যখন চন্দ্রনাথ চৌধুরির সঙ্গে কাছারিবাড়িতে ঢোকেন, তাঁর দৃষ্টিতে এবং মনে তীব্র সতর্কতা ছিল। জমিদারি ফাঁদগুলি এবং নিষ্ঠুরতাগুলি তাঁর পরোক্ষে-প্রত্যক্ষে জানা ছিল। দীর্ঘ পাম তরুশ্রেণীর আড়ালে কোনও ছায়ামূর্তি ওত পেতে আছে কি না, প্রাসাদের সোপানে পাইকসর্দার ও তার সাঙ্গোপাঙ্গোদের চেহারা আবছা আলোয় যেটুকু পরিদৃশ্যমান, তাতে স্বাভাবিক হিংস্রতার ছাপ কুটিলতর কি না, এই সকল তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণের মধ্যে ছিল। কিন্তু আলোছায়ায় অস্পষ্টতার দরুন এই পেশীসমাবেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য নির্ণয় করতে পারছিলেন না।

ফলে তিনি হলঘরের ভেতর না ঢুকে বারান্দার একটি স্তম্ভে ঠেস দিয়ে দাঁড়ান। চন্দ্রনাথের প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেন, খোলা মনে কথা বলতে হলে খোলা জায়গায় বসা দরকার। আরও দরকার নির্জনতা। ওই দ্বিপদ প্রাণীগুলি এমনিতেই তাঁর চক্ষুশূল, তদুপরি এত রাতে তাদের উপস্থিতিও তাঁর মনকে কটু করছে। জমিদারবাবু যদি কপটতা না চান, তাহলে ওদের ঘুমোতে যেতে বলুন। সোপানের শীর্ষে চবুতরাটি উপযুক্ত স্থান। পাথরের আসনগুলিও মসৃণ এবং শীতল। তিনি অকম্পিত স্বরে সপ্রতিভ ভঙ্গিতে কথাগুলি বলেন।

চন্দ্রনাথ চৌধুরি বিকটহাস্যের পর বলেন, খানসাহেবকে তিনি দুঃসাহসী এবং অলৌকিক শক্তিধর পুরুষ বলে জানতেন। ধূর্ত চন্দ্রনাথ খোঁচাটি বুঝেছিলেন।

মজহারউদ্দিন বলেন, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ জরা নামক নিতান্ত একজন ব্যাধের শরাঘাতে নিহত হন। রামচন্দ্র জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন। বুদ্ধ উদারাময়ে দেহত্যাগ করেন। ইসলামের পয়গম্বর যখন মৃত, তখন তাঁর অন্যতম প্রধান অনুচর ওমর তলোয়ার খুলে গর্জন করেছিলেন, পয়গম্বরকে যে মৃত বলবে, তার জিভ কেটে ফেলব। প্রবীণ অনুচর আবুবকর তাঁকে স্মরণ করিয়ে

দেন, হজরত কি পুনঃপুনঃ বলেননি যে তিনি মরণশীল মানুষই ? তাই শুনে ওমর সত্য উপলব্ধি করেন। হ্যাঁ, হ্যাঁ, হিন্দুশাস্ত্রে পঞ্চজন অমর মানুষের কথা আছে। কিন্তু মজহারউদ্দিন একজন পাঠানবাচ্চা মাত্র। তিনি জন্মসূত্রে মুসলমান। কাজেই ওই পঞ্চজনের মধ্যে পড়েন না। মরণশীল নগণ্য এক মানুষ মাত্র। তাঁর যত বুজরুকি গানে। কিন্তু এ তো গানের আমন্ত্রণ নয়। এসব কথা বলার সময় তিনি পুনঃপুনঃ দুকানের লতি স্পর্শ করছিলেন।

চন্দ্রনাথ গম্ভীর হয়ে পাইকদের স্থানত্যাগের নির্দেশ দেন। তারপর চবুতরায় বসে কণ্ঠস্বরে বিষণ্ণতা এনে বলেন, বোঝা গেল, খানসাহেব তাঁকে বিশ্বাস করেন না। বিশ্বাস একটা মর্যাদার জিনিস। যাই হোক, আপাতত এ নিয়ে তাঁর মাথাব্যথা নেই। তিনি শুধু জানতে আগ্রহী, পণ্ডিত লোকটির প্রকৃত পরিচয় খানসাহেব জানেন কি না—যেহেতু তাঁর কাছে খবর আছে, উভয়ের মধ্যে গভীর হৃদত্যা আছে।

মজহারউদ্দিন বলেন, কোনও প্রশ্নের উদ্দেশ্য না জানা থাকলে তার সঠিক উত্তর দেওয়া কঠিন হয়।

একটু চুপ করে থাকার পর চন্দ্রনাথ বলেন, তাঁর পিতার জীবনের কেলেংকারির পুনরাবৃত্তি তাঁর পক্ষে অসহনীয়। খানকির টাঁড় এবং খানকি পুনরুজ্জীবিত হোক, এটা কী করে বরদাস্ত করা যায় ? খানসাহেব নিজেকে চন্দ্রনাথ চৌধুরিতে পরিণত করে একটু ভেবে দেখুন।

মজহারউদ্দিন বলেন, রাজা-জমিদারদের কলঙ্ক গাত্রশোভা। প্রজাসাধারণ এবং সমাজপতিরা জানেন, এটা চিরাচরিত রীতি। তাঁদের একদল শাস্ত্রজ্ঞ পতিত সাব্যস্ত করলে আরেকদল শাস্ত্রজ্ঞ শাস্ত্র খুলেই তা ভ্রান্ত বলে প্রমাণ করবেন। নবদ্বীপ থাকলে কাশী আছে। আর শাস্ত্র এমন জিনিস, যাতে হ্যাঁ-কে না এবং না-কে হ্যাঁ করা কঠিন নয়। কিন্তু এসব ফালতু। সামান্য বাহান্ন বিঘা মাটির জন্য মাথা খারাপ করে লাভ কী, মাটিটা যদি সত্যই আইনমোতাবেক অন্যের হয় ?

চন্দ্রনাথ ক্রোধ চেপে বললেন, 'আমার নাকে ঝামা ঘষার ব্যাপার। কুলখাড়ির শুওরের বাচ্চারা লাই পেয়ে আরও মাথায় উঠবে। তাদের দেখাদেখি আরও দু-দশখানা গ্রামের লোকের সাহস বাড়বে। বিনা বন্দোবস্তে বেআইনি ভোগদখল ঠেকানো যাবে না। আপনি তো জানেন, হাউলির বিলের জল শুকোলে হাজার-হাজার বিঘেয় লাঙ্গল পড়ে। গোমস্তা পাঠালে মেরে ভাগিয়ে দেয়। পাইক পাঠালে দাঙ্গা হয়। থানা-পুলিশ করেও কুল পাই না। দারোগা হাম্বিতম্বি

করতে করতে যায়। ফিরে আসে মুর্গি-হাঁস-ডিম-মাছের ঝুড়ি নিয়ে। পুলিশ সায়েবকে ধরলে বলেন, অত ফোর্স কোথায় ? আপনি জমিদার। আপনি শক্ত হোন। বুঝুন তা হলে !'

মজহারউদ্দিন চুপ করে আছেন দেখে চন্দ্রনাথ আবার ফোঁস করলেন। 'এই গোদের ওপর বিষের ফোঁড়া বন্দেমাতরমওলারা। হুজুগের একটা ছুতো পেলেই হল। মেদিনীপুর-বর্ধমানে কী হচ্ছে, খবরের কাগজ পড়লে জানতেন। জমিদারি—এই পার্মানেন্ট সেট্‌লমেন্ট কী ফাঁদ, জমিদার হলে সেটা বুঝতেন।'

মজহারউদ্দিন তবু চুপ।

চন্দ্রনাথ বললেন, 'আপনি চিন্তেকে মকসুদা বেগমের কথা বলেছেন !'

এবার মজহারউদ্দিন বললেন, 'না বলে উপায় ছিল না।'

'তিনি আপনার কে হন, বলতে আপত্তি আছে ?'

'আর নেই। তিনি আমার দাদিমা—ঠাকমা।'

'আপনার ঠাকমা ?' চন্দ্রকান্ত চৌধুরি নড়ে বসলেন। কিছুক্ষণ পরে বললেন, 'কিন্তু সেতাপগঞ্জের নিলামের কাগজ জাল কি না, বিশ্বাস করুন, আমি জানি না।'

'জাল।'

'আড়াইখানা মৌজার ওই ছিটমহাল নিয়ে আমি জেরবার। আপনার ঠাকমাকে খবর দিন। তিনি এসে মহালে বসুন। দেখুন, কী অবস্থা ! বিশ হাজার টাকার ওপর রাজস্ব বাকি পড়েছে। আর ঠেকানোর সাধ্য নেই আমার। সেতাপগঞ্জে কালেক্টরি থেকে নিলামের ডুগডুগি বেজে উঠল বলে।'

হঠাৎ মজহারউদ্দিন বললেন, 'ইন্দ্রের সঙ্গে পণ্ডিতের বেটির বিয়ে দিলে সব নিষ্পত্তি হয়। কিন্তু পণ্ডিতের আপত্তি আছে। আপত্তি কি আপনারও আছে ?'

'আমাবর আপত্তি বিয়েতে নয়, অন্যত্র।'

'খুলে বলুন।'

'খানকির টাঁড়ে আবাদ বসাতে চাইলে বাইরের লোক আনাও বিপদ। কুলখাড়িওলাদের সঙ্গে তাদের সবসময় হাঙ্গামা বাধবে। সেজন্যই ওদিকে হাজার-হাজার বিঘে মাটি অনাবাদি পড়ে আছে মাটিটা দিতে হলে কুলখাড়িওলাদেরই দিতে হবে। সেটাই আমার চরম বেইজ্জতি। ওরা যতটা মাটির খাজনা দেয়, ভোগদখল করে তার চতুর্গুণ। আর, শুধু কুলখাড়ি একা নয়, আরও কত বসতি আছে, আপনি জানেন। বললামও একটু আগে।'

'অন্নদারানীর টাঁড়ে যদি আবাদ না বসায় প্রজ্ঞা ?'

'কী অদ্ভুত কথা বলছেন আপনি ! রোজ ওখানে মেয়েটা যাচ্ছে। লোকেদের সঙ্গে কথা বলছে। লোকে লোকারণ্য।'

'খানিকটা হুজুগও আছে, চৌধুরিমশাই ! খানিকটা মজা দেখা, খানিকটা কৌতূহল।' মজহারউদ্দিন একটু হাসলেন। 'কেউ বলত খানকি, কেউ বলত দেবী। তার পেটের মেয়ে !'

চন্দ্রনাথ উষ্ণ মেজাজে বললেন, 'কিন্তু বীরহাটায় সেই কৌতূহল নেই কেন ? আমার ওই আকাট মুখ্যু গর্দভ পুত্রের কথা ছেড়ে দিন।'

'বীরহাটা কারবারি জায়গা। নিজেকে নিয়েই মশগুল। বীরহাটার স্বভাব হল, তার কাছেই দূরের লোকেরা আসুক, সে নিজে দূরে যাবে না। যায়নি, যায়ও না কোনও দিন।'

'হেঁয়ালি আপনারও স্বভাব, লক্ষ করেছি।'

'খুব সাফ কথা, চৌধুরিমশাই। শহর-নগর নিজের মধ্যে আঁটো হয়ে থাকে। মৌমাছির চাক।' মজহারউদ্দিন আরও জটিল ভাষায় বললেন, 'চালচিত্তির নৈলে প্রতিমার রূপ খোলে না। অগম্য খালবিল জঙ্গলের দুনিয়ায় যা মানানসই, শহর-নগরের দুনিয়ায় তা বেমানান।'

'আপনি অদ্ভুত মানুষ, খানসাহেব !'

'বীরহাটার লোকের চাষবাস আছে। কিন্তু সেই চাষের মাটির সরহদ্দি ছাড়িয়ে দূরদূরান্তে কবে কী ঘটেছিল বা এখন কী ঘটছে, তা নিয়ে মাথা ঘামাতে যাবে ক'জন ? বড় জোর অবরেসবরে চণ্ডীমণ্ডপে কি বৈঠকী মজলিশে কিঞ্চিৎ আদিরসের খেউড়—এইমাত্র। তবে আগেই বলেছি, রাজা-জমিদার-বড়লোকের গাত্রশোভা হল, স্ত্রীলোকঘটিত কেলেংকারি। যার পয়সা আছে, তার রক্ষিতা না থাকলে সবাই ভাবে, এ ব্যাটা এক বলদ ! সেকালে রাজা বাদশা নবাব বা সম্রাট বাহাদুরদের ঝাঁকেঝাঁকে উপপত্নী রাখার মূল কারণ নেহাত দৈহিক লালসা নয়, কিংবা শুধু রাজশক্তির অহঙ্কার দেখানোও নয়, প্রজাদের কাছে নিজের দেহের বিশেষ একটি অঙ্গেরও শক্তি জাহির। দ্যাখ্, ব্যাটারা, আমি সর্বশক্তিমান !' মজহারউদ্দিনের কথায় তিক্ততার ঝাঁঝ ছিল। একই গতিতে বললেন, 'হেকিমি একটি দাওয়াই আছে। তার নাম সোলেমানি আরক। বাদশা সোলেমান নাকি ওই আরকের জোরে একনাগাড়ে একশো স্ত্রীলোকের কামতৃষ্ণা···' হঠাৎ থেমে গেলেন শালীনতাবশে। ত্রস্তে দুকানের লতি স্পর্শ করলেন।

চন্দ্রনাথ চৌধুরি অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসতে লাগলেন। তারপর পুনঃগম্ভীর হয়ে বললেন, 'কাজের কথাটা সেরে নিই। আমার প্রশ্ন হল, পণ্ডিত লোকটি সত্যিই

অন্নদারানীর স্বামী কি না। আর ওই মেয়েটি সত্যিই অন্নদারানীর মেয়ে কি না। ধরুন, আমি যদি আইনমোতাবেক প্রমাণ চাই?'

মজহারউদ্দিন বললেন, 'মতিহারি থেকে লোক এনে যদি প্রমাণ দাখিল করেন পণ্ডিতমশাই?'

'সেই লোকেরা যদি সাজানো সাক্ষী হয়?'

'বুঝলাম, আপনি তা হলে মামলা লড়ার ছক কষেছেন!'

'না। কথার কথাই বলছি।'

'আপনি কি অন্নদারানীকে দেখেছিলেন?'

'নাঃ। বাবার ব্যক্তিগত ব্যাপারে নাক গলানোর প্রবৃত্তি ছিল না।'

'আমি বলি, সামান্য বাহান্নবিঘে মাটি নিয়ে মাথা ঘামাবেন না।'

চন্দ্রনাথ ফণা তুললেন। 'আমার ইজ্জত! যে জঙ্গল-মহালকে শায়েস্তার জন্য ঘিলু জল করছি, সেই মহালে শনির ছিদ্র দেখতে পাচ্ছি। এক ঠক আর এক ঠগিণী ছিদ্র খুঁড়তে এসেছে। পেছনে লোক না থেকে পারে না। তার উদ্দেশ্য একটা বড় রকমের লণ্ডভণ্ড। মাটি ফললে খাজনার অঙ্ক বাড়বে। কিন্তু রক্ত ঝরবে বেশি।'

'এও বোঝা গেল, আপনি যাচাই করতে চাইছিলেন, মকসুদা বেগমের পৌত্র সেই লোক কি না।'

'অবশ্যই। আপনি দলিল চুরি করেছেন...'

'আমি চোর। কিন্তু এবার খুলে বলাই উচিত হবে যে, ওটা ইন্দ্রবাবাজিরই তাগিদে। নিন, এবার দেখি, ছেলেকে কী শাস্তি দিচ্ছেন।'

'ওকে আমি ত্যাজ্যপুত্র করব!' চন্দ্রনাথ প্রায় গর্জন করলেন। এতক্ষণে স্বমূর্তি।

মজহারউদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। 'তাতে ইন্দ্রবাবাজির কোনও ক্ষতি হবে না। তার দাদুর উইলে যে সম্পত্তি দেওয়া আছে, তাতে স্বচ্ছন্দে দিনগুজরানের অসুবিধে নেই।'

চন্দ্রনাথ শ্বাসপ্রশ্বাসে জড়িয়ে-মড়িয়ে এই কথাগুলি বললেন। 'কানে এসেছিল, একটা সাংঘাতিক লোককে কাছারিবাড়ির সেরেস্তায় ঢুকিয়েছি, সে সূচ হয়ে ঢুকেছে, ফাল হয়ে বেরুবে। ঠিক আছে। চিন্তামণির হুকুমেই বহাল রইল।'

মজহারউদ্দিন সোপানে পা রেখে বললেন, 'আপনি আমার চাকরি ফিরিয়ে দেবেন এবং আমিও সুড়সুড় করে সেরেস্তায় ঢুকে কলমবাজি করব ভেবেছিলেন জেনে অবাক লাগছে চৌধুরিমশাই। আপনি আমাকে চিনতে পারেননি।

ভেবেছিলেন, বশ মানাবেন। আমি নিজের হুকুমই নিজে মানি না। বোঝেননি ?'

চন্দ্রনাথ এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'বুঝিনি বলেই তো এত কাণ্ড।'

এই সময় ফটকের পেটাই ঘড়িতে ঘণ্টা বাজতে লাগল। মজহারউদ্দিন থমকে দাঁড়িয়েছিলেন। ফটক খুলে যাচ্ছে। ফটকের বাতিদান থেকে যেটুকু আলো ছড়াচ্ছে, তাতে এক ঘোড়সওয়ারের ধাবমান মূর্তি স্পষ্টতর হচ্ছিল। ঘোড়াটি পণ্ডিতের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। চন্দ্রনাথ দ্রুত হলঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং দোতালায় উঠে গেলেন। মজহারউদ্দিন দাঁড়িয়ে রইলেন। ইন্দ্রকে দুহাতে পেছন থেকে আঁকড়ে ধরে বসে ছিল প্রজ্ঞা। প্রথমে ইন্দ্র নামল এবং দুহাত বাড়াল। প্রজ্ঞাকে নামাল। প্রজ্ঞা এক লাফে বারান্দায় উঠে গেল।

এবার মজহারউদ্দিন সাড়া দিয়ে কাছে গেলেন। ইন্দ্র তাঁকে দেখতে পেয়ে বলল, 'আদাব চাচা'! প্রজ্ঞা বারান্দা থেকে বলল, চাচা ? বাবা কোথায় জানেন ?'

মজহারউদ্দিন বললেন, 'তোর বাপকে যদি শালা বলি, সেটা গালাগালি হলেও তাতে আমি চাচার বদলে তোর ফুফা, মানে পিসে সাব্যস্ত হই। সে বোধ করি ভেগে গেছে। বাউণ্ডুলে উচ্ছন্নে শালা !'

বলে বারান্দায় উঠে গিয়ে হ্যাঁচকা টানে তালা আঁটা শেকলটা উপড়ে ফেললেন। এসব ঘর রায়-রায়ান আমলের। কপাটের কাঠ মজবুত। কিন্তু লোহায় মরচে। এ বিষয়ে কয়েকটি বাক্য রচনার পর মজহারউদ্দিন নেমে এলেন। ইন্দ্র বলল, 'এত রাতে এখানে একা কী করছিলেন ?'

'তোর বাপের সঙ্গে তকরার চলছিল।' মজহারউদ্দিন মৃদু স্বরে বললেন। 'বেটির জানমালের জিম্মাদারি এখন থেকে তোর। হুঁশিয়ার বাপ ! অন্তত এই রাতটার জন্য পণ্ডিতের বেটিকে আগুলে রাখ্।'

ততক্ষণে প্রজ্ঞা লণ্ঠন জ্বেলেছে। ডাকল, 'চাচা ! ঘরে আসুন।' কণ্ঠস্বরে মিনতি ছিল। ব্যাকুলতাও ছিল।

'কথাবার্তা যা হবার, কাল হবে।' মজহারউদ্দিন ইন্দ্রের দিকে ঘুরলেন। এতক্ষণে ছক্কামিয়া এসে ঘোড়াটাকে টহল খাওয়াতে নিয়ে গেল। 'কী বলেছি, বুঝেছিস বাপ ?' মজহারউদ্দিন তার কাঁধ স্পর্শ করলেন।

ইন্দ্র বলল, 'একটু-একটু বুঝেছি।'

'ব্যস ! ব্যস ! কাল বাকিটা বুঝিয়ে দেব।' মজহারউদ্দিন হাত বাড়িয়ে বললেন, 'তোর চিরিক বাতিটা দে। জান দিই তো লড়েই দিই। পাঠানবাচ্চা। আঁধারে দুশমনের মুখ না দেখে মরলেও কষ্ট।'

ইন্দ্র দ্রুত পিঠ থেকে রাইফেল হাতে নিয়ে বলল, 'চলুন ! পৌঁছে দিয়ে আসি।'

'কন্যে অরক্ষিতা থাকবে। কে জানে, এ রাতে খালি গা ছমছম করে কেন ?'

প্রজ্ঞা কান করে শুনছিল। তখনই ঘরের দরজার কপাটের আড়াল থেকে কী একটা জিনিস বের করে বলল, 'আপনি পাঠানবাচ্চা। আর বাবা বলেছিলেন আমরা নাকি মারাঠাবংশ।'

'ত্রিশূল নাকি রে ? দেবীদর্শন হল। দণ্ডবৎ হই মা !' বলে মজহারউদ্দিন পা বাড়ালেন। ইন্দ্র দুধারে দূরে ও সামনে আলো ফেলতে ফেলতে পাশে হাঁটতে থাকল। গায়ক গুনগুনিয়ে মালকোষ ভাঁজছিলেন। হঠাৎ সুর থামিয়ে বললেন, 'বাথানে ছিলিস, সে খবরও তোর বাপের কানে যায় ! তোদের পেছনে সারাক্ষণ ফেউ।'

ইন্দ্র গ্রাহ্য করল না। বলল, 'পারুর কিচ্ছু বুঝতে পারছি না, চাচা। কুলখাড়িতে গিয়ে আহিরডি, মধুঝাড়া, শেতলদ থেকে মোড়ল মাতব্বরদের ডাক পাঠাল। বলল, অন্নদামাকে বাঁচাতে হবে। গাছ মাটি ঘাস প্রাণী সবকিছুই পবিত্র সেখানে। বাইরের মুলুক থেকে লোক এসে ওই মাটি অপবিত্র করবে তারা থাকতে ? মায়ের বাহনকে মারতে গোরা সায়েবমেম এনেছিল। পারল মারতে ? অন্নদামাকে রক্ষা করাই এ সময়ে বড় কাজ।'

'মোড়লরা কী বলল ?'

ইন্দ্র একটু হাসল। 'জংলি লোক সব। আমার চেয়েও আকাট। একবাক্যে বলল, অন্নদামায়ের টাঁড় রক্ষা করতে শূন্য নদী তাদের রক্তে ভরে যাক।' ইন্দ্র নকল করল তাদের শপথবাক্যগুলি। 'মুসলমানরা বলল, লোহু বহে যাবে খালি লধিতে। হিন্দুরা বলল, অক্তগঙ্গা হবে এই লধি।'

'বেটি মায়ের চেয়ে সরেস।'

'কিন্তু কতদিন এভাবে ধোকা দিয়ে রাখা যাবে ওদের, সেটা ভাবছে না !'

'বাথানে কেন গেলি তোরা ? উড়োপাখির ছায়ার পেছনে দৌড়ুতে ?'

'বিহারী গয়লাদের একজন—নাথুরাম, সে অন্নদারানীকে দেখেছিল। আমিও জানতাম না, ওরা মাইজি বলে টলে। পারু নাথুরামের কাছে তন্নতন্ন করে মায়ের সব কথা শুনল। ফেরার পথে কেঁদেকেটে সারা।' ইন্দ্র শ্বাস ছেড়ে বলল, 'সামলানো যায় না, এমন বন্যা। একটু জোর খাটাতে হল।'

'জোর খাটালি ? বলিস কী রে ?'

ইন্দ্র ঈষৎ কুণ্ঠিতভাবে বলল, 'তুলে ঘোড়ার পিঠে বসিয়ে দিয়েছিলাম।'

'ইন্দ্র !'

'বলুন চাচা ?'

ফটক পেরিয়ে গিয়ে মজহারউদ্দিন বললেন, 'পরে কথা হবে। যা ! এই যথেষ্ট।'

'কেন ডাকলেন, না শুনে যাব না।'

ইন্দ্রের কণ্ঠস্বরে গোঁয়ার্তুমি ছিল। একটু চুপ করে থাকার পর মজহারউদ্দিন বললেন, 'জঙ্গলের এক দেবী আছেন। পণ্ডিতশালা বলেছিল অরণ্যানী। তো অরণ্যানী থাকেন অরণ্যে। তুই হিঁদুর ছেলে। লক্ষ করেছিস কি ? দেব-দেবীদের বেদী থাকার নিয়ম। এখানকার লোকে বলে পাটা। জঙ্গলের দেবী জঙ্গলের পাটায় না বসলে শোভা খোলে না। মাহাত্ম্য জাগে না। দ্যাখ্ বাবা, মুসলমান শাস্ত্র বলে, আল্লাহ নিরাকার। কিন্তু তাহলে আল্লাহের আরশ কথাটা এল কেন ? আরশ মানে সিংহাসন। এই নিয়ে এক মৌলবির সঙ্গে খুব তক্ক হয়েছিল। তাঁর মতে আল্লাহের আরশ আর আল্লাহ্ এক। তিনি থাকলে তাঁর আরশও থাকবে। বাতাস কী ? নিরাকারও একরকম আকার কিন্তু সাকার-এর দন্ত্য স-তে যত ঝুটঝামেলা। নুর বা জ্যোতি হল একরকম আকার কিন্তু মাটি পাথর ওই দন্ত্য স। মৌলবির কথা শুনে বললাম, জি হুজুর ! তাই মানলাম। কিন্তু ভেবে দেখুন আল্লাহের নাম জপছেন। হাতের তসবিহ্ বা জপমালায় কবার নাম জপছেন তার হিসেবও রাখছেন। ওটা আপনার জপের সেরেস্তাবহি। আরও বলি, বৈষ্ণবরাও এই কম্মটি করেন। তা হলে হরেদরে দেখা যাচ্ছে, মাটি দিয়ে তৈরি আদমবংশধর সাংসারিক স্থূল দিয়েই সূক্ষ্মকে বুঝতে চায়। আমরা কথা দিয়েই ভাবকে ধরতে চাই কি না ? আল্লাহ কথাটি কী ? মৌলবি বুঝলেন না। তুই কি কিছু বুঝলি ?'

ইন্দ্র হাসতে লাগল। 'কান ভোঁ ভোঁ করছে। তবে কিঞ্চিৎ বুঝেছি।'

'জঙ্গলের দেবীকে গিয়ে বল্, রাত পোহালেই যেন নিজের পাটায় গিয়ে বসে।'

কথাটি বলেই মজহারউদ্দিন গুনগুন করে সুর ভাঁজতে ভাঁজতে আখড়ার দিকে চলে গেলেন। ইন্দ্রের লম্বা টর্চের আলোয় মূর্তিটি অসম্ভব শাদা দেখাচ্ছিল। সে ভাবতে ভাবতে ফটকের দিকে ঘুরল। কে ওই মানুষ ? প্রশ্নটি তাকে শিহরিত করছিল। টর্চের আলো শাদাকে কি এত বেশি শাদা করতে পারে ?...

আপনমনে ভাইরোঁ রাগে রেওয়াজ করছিলেন গায়ক। বিছানায় আসন করে

বসে তানপুরায় ঝংকার দিতে দিতে প্রতি ঊষাকালে চিত্তশুদ্ধির এই সাধনা। দরজা ভেতর থেকে বন্ধ থাকে। ধাক্কার শব্দে তানছুট্ হল। খাপ্পা হয়ে তানপুরা রেখে তক্তাপোশ থেকে নামলেন। ঘরের ভেতর আবছা আঁধার। সতর্কতার জন্য জানালাদুটি বন্ধ ছিল। বিছানার পাশে একটি খোলা তলোয়ার ছিল। দরজা খোলার আগে তলোয়ারটির দিকে একবার ঘুরলেন। একটু দোনামনার পর রুষ্ট স্বরে বললেন, 'কে রে?'

বাইরে থেকে সাড়া এল, 'আমি।'

দরজা খুলে বললেন, 'নিজের স্বার্থ দিয়ে অন্যের স্বার্থকে কোপ মারাই মানুষের রীতি রে! এখনও পাখপাখালির ঘুম ভেঙেছে কি ভাঙেনি?'

প্রজ্ঞা ভেতরে ঢুকে তক্তাপোসে বসল। 'রাতেই আসতাম। ঘরের দরজায় দারোয়ান আসতে দিল না।' কণ্ঠস্বরে উষ্ণতা তীব্র ছিল। পুনঃ বলল, 'আমার আবার কলঙ্কের ভয়? কিন্তু বারান্দায় খাটিয়া পেতে দারোয়ানি! জ্বালার ওপর জ্বালা। আর সহ্য হল না। অপমানের চূড়ান্ত করে তাড়িয়ে দিয়েছি।'

'দারোয়ানিটা আমার দেওয়া কাজটা ঠিক করিসনি।'

'ঠিক-বেঠিক আমি বুঝব। কিন্তু নাটের গুরুর কাছে জানতে চাই, মাছ ধরার জন্য এতটা বেশি জল ঘোলানোর কী দরকার ছিল? মাছ কি জল ঘোলা না করলে ধরা যায় না?'

'জল ঘোলা তো তুইই করেছিস।' মজহারউদ্দিন খুব আস্তে বললেন। 'জবাব দে, প্রথমে এই নাটের গুরুর কাছে না এসে ইন্দ্রের কাছে গিয়েছিলি কেন? নিজেকে খুব চালাক ভেবেছিলি! ইন্দ্রকে কতটুকু চিনিস?'

প্রজ্ঞা মুখ নামিয়ে বলল, 'আমি কেমন করে জানব যে...'

তাকে থামিয়ে মজহারউদ্দিন বললেন, 'জানলেও কি আসতিস? বলেছিলাম, সাপ নিয়ে খেলা তোর স্বভাব। তুই যে বেদেনী! মায়ের আত্মা তোকে সত্যিই ভর করেছে।'

'আমার মাথার ঠিক নেই।' প্রজ্ঞার কণ্ঠস্বর ভেঙে গেল।' নিজেকে আর বিশ্বাস করতে পারছি না। কাল রাত থেকে আমি পাগল হয়ে গেছি। কী করব, ভেবে পাচ্ছি না।' সে মুখ নামিয়ে রাখল।

ইন্দ্র তোকে বলেনি মায়ের টাটে গিয়ে বসতে?'

'বলেছে।'

'যাবি তো?'

'ভাবছি।'

মজহারউদ্দিন ধমক দিয়ে বললেন, 'কী ভাবছিস ? পাইক দিয়ে ঘর থেকে গলাধাক্কা দিয়ে বের করে দেবে। ত্রিশূল দিয়ে ঠেকাবি ? দারোগা আসবে সেপাই নিয়ে। ত্রিশূল দিয়ে ঠেকাবি ? জঙ্গলের দেবী জঙ্গলে কেরামতি দেখায়। এটা জঙ্গল ভাবছিস ?'

'ওকে আমি যা নয় তাই বলে অপমান করেছি।' প্রজ্ঞা দুহাতে মুখ ঢাকল। 'আমার খারাপ লাগছিল। ও বাইরে, আমি ঘরের ভেতর।
যতবার দেয়ালটার দিকে তাকিয়েছি, দরজাটা ততবার কটমট করে তাকিয়ে দাঁতে দাঁতে ঘষেছে। আমি ভয়ে থরথর করে কেঁপে উঠেছি। কাছের জিনিস হঠাৎ দূরে সরে গেলে মাথা খারাপ হয়ে যায়।'

সে ভিজে চোখে মুখ তুলল। মজহারউদ্দিন একটু অবাক হলেন। একটা আকাশই দেখছেন। এই মেঘ-বজ্র-বিদ্যুৎ-ঝড়-বৃষ্টি, এই উজ্জ্বল তুমুল রৌদ্র। ফোঁস করে নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'সূর্য উঠুক। দেখছি কী হয়। ঘরে গিয়ে বসে থাক্। চাঁদু শালা জানে, তার প্রাণভোমরা অন্যের হাতে। যা, ওঠ্। ঘরে যা।

প্রজ্ঞা চলে যাওয়ার পর ভাবতে ভাবতে সহসা চমকে উঠলেন মজহারউদ্দিন। পণ্ডিতের বেটির শেষ বাক্যগুলির দিকে ঘুরে জরিপ করতে থাকলেন। দরজার কটমট করে তাকিয়ে দাঁত ঘষা, কাছের জিনিসের দূরে সরে যাওয়া ! তা হলে কি আজই কিছু ঘটেছে বনেকান্তারে ? জানিয়ে দিয়ে গেল তাঁকে অকপটে ! মেয়েদের জীবনে এমন একেকটা সময় আসে, যখন সমস্ত সংকোচ-লজ্জা-ভীরুতাকে লাথি মেরে সরিয়ে দুঃসাহসে নিজেকে খুলে ধরে। আর, ইন্দ্রও বলছিল, একটু জোর খাটিয়েছে প্রজ্ঞার ওপর। ঘোড়ার পিঠে তুলে বসিয়ে দিয়েছে। সে কোন ঘোড়া ! যে ঘোড়াটির পিঠে দুজনে একাত্ম হয়ে কাছারিবাড়িতে এসে ঢুকল (চন্দ্রনাথেরও চোখে পড়ে থাকবে), এই ঘোড়াটি সেই আসল ঘোড়ার নিছক তসবির কি ? কায়ার ছায়ামাত্র ?

মজহারউদ্দিন দুকানের লতি ছুঁয়ে মনে মনে বললেন, তাই হোক, তাই হোক, তাই হোক। তবে প্রেম মুহব্বত অবশ্যই চিৎপ্রকর্ষ। কিন্তু মাটি পা রাখার জায়গা। আর মূল লড়াইটাই যে মাটি নিয়ে। পণ্ডিতের বেটি তো প্রেম করবার জন্য বীরহাটায় ছুটে এসে ডেরা পাতেনি ! এবার দেখার বিষয় প্রেম আর মাটির সম্পর্ক কেমনতর।

নেওটা সাগরেদ গুনু ওস্তাদের ক্ষৌরকর্মে এল, তখন সকালবেলার পারিপার্শ্বিক বসন্তকালীন উজ্জ্বলতায় ফুলবাবু। গুনু দেখল, তার ওস্তাদ

কোমরের দুই খাঁজ দুহাতে আঁকড়ে আকাশ দেখছেন। গুনু সাড়া দেওয়ার ভঙ্গিতে বলল, 'মাঘ গেল। ফাগুন গেল। চত্তির যায়-যায়। না মেঘ, না ঝড়। রাজার পাপে প্রজার পাপ'। নরসুন্দরবংশে তার জন্ম। তাই কথার কারবারি। কালে-ভদ্রে সুযোগ পেলে কথাবাজ ওস্তাদকেও টেক্কা দেয়। আরও বলতে লাগল, 'বংশ লম্পটের। অত ভাল মেয়েটাকে পটিয়ে-পাটিয়ে মাথা খারাপ করে দিল! বেগতিক দেখে শেষে জন্মদাতা পিতাঠাকুর লজ্জায় দেশান্তরী। বীরহাটার যে মানুষকেই কামাতে বলি, সেই বলে গুনু! চাকা একই পাকে ঘুরছে রে! আমি বলি, কেন? চাকা কি উল্টো পাকে ঘুরবে এমন দিব্যি দেওয়া ছিল? ছিল। ছোটবাবু বনজঙ্গল বোঝেন। ঘোড়া বোঝেন। বন্দুক বোঝেন। শুওর বাঘ এসব সাংঘাতিক জন্তুজানোয়ারও বোঝেন। সেবার পেল্লায় একটা শঙ্খচূড় মারলেন। সেই ছোটবাবু এতদ্দিনে মেয়েমানুষ বুঝলেন। জিনিসটা রক্তে থাকে।'

ওস্তাদ এতক্ষণে ঘুরে দেখলেন বারান্দার নীচের চত্বরে পাষাণখণ্ডটির সামনে বসে গুনু হাঁটুতে আটকানো চামড়ার ফালিতে ক্ষুর শানাচ্ছে এবং পাষাণ-আসনে অদৃশ্য মজহারউদ্দিন যেন সমাসীন। রাগ করে বললেন, 'সবসুদ্ধু চেঁছে ন্যাড়া করে দে শালাকে।'

অপ্রস্তুত নরসুন্দরযুবা বললে, 'আজ্ঞে, কাকে?'

'যে তোর সামনে বসে আছে।'

গুনু হাসতে লাগল। 'আপনারই শিক্ষা! আগে ধ্যান। ধ্যানে না বসলে আগমন হয় না। আমি ধরেকেটে মেরেকেটে করি, আপনি করেন পিড়িংপিড়িং। কতক্ষণ পরে রাগ-রাগিনীর আগমন। ভাবুন, তখন কী অবস্থা হয়? এই যে ক্ষুর শানাচ্ছি, সেটা আমার ধ্যান।'

গায়কও একটু হাসলেন। 'তুই নরসুন্দরের পো। যত কথা খরচ করিস, রোজগার করিস তার দুনো। আমি শালা খালি ভূতের বেগার খেটে মরি।'

'আজ ওস্তাদের কী গণ্ডগোল আঁচ করে ভাবছি, পাটায় বোধ করি বসবেন না।' গুনু ক্ষুরটি সতর্কতাবশে ভাঁজ করে বলল, 'অ্যাদ্দিন কথাটা সাহস করে বলিনি, পাছে ভুল বোঝেন। আজ বলতে আজ্ঞা হোক।'

'হল।'

'মুনিঋষি যাত্রার আসরেই দেখেছি। সাধুসন্নেসি তো আনাচে-কানাচে অনেকেই দেখতে পাই। মুনিঋষি আর সাধু সন্নেসি এক জিনিস বললে পাটালি আর ভেলিগুড়কে এক বলতে হয়। তো ওস্তাদজিকে দেখি আর ভাবি, দাড়ি

রাখলে জগৎ সংসারেই মুনিঋষিদর্শন হত।'

'ও রে নরসুন্দরের পো, আমি জেতে মোছলমান। খেয়াল হলে আল্লাকেও ছজি।'

গুনু পা ছড়িয়ে বসল নগ্ন মাটিতে। 'সংসারে কে কোন রূপ ধরে ঘোরে, চেনে সাধ্য কার?'

মজহারউদ্দিন গালে হাত বুলিয়ে বললেন, 'তাই হল। তোর মুনিঋষি দর্শনের ইচ্ছে পূর্ণ হোক।'

গুনু তাতে উৎসাহ প্রকাশ করল না। বরং উদ্বিগ্ন হয়ে বলল, 'গণ্ডগোলটা কিসের?'

মজহারউদ্দিন থাপ্পড় তুলে বললেন, 'পাড়ায়-পাড়ায় দিনমান ঘুরিস। বললাম না যত কথা খরচ করিস, উসুল করিস তার দুনো? ন্যাকা!'

গুনু বুড়ো আঙুল নেড়ে বলল, 'বয়ে গেল আপনার! লোকে বলত, ছুঁচ হয়ে ঢুকেছেন, ফাল হয়ে বেরুবেন। শুনছি, তা-ই নাকি বেরিয়েছেন। সত্যি-মিথ্যে আপনিই জানেন।'

মজহারউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'ফাল হয়ে বেরিয়েছি শুনছিস?'

'আজ্ঞে!' গুনু কাঁচুমাচু হাসল। 'নাপিত দেখলে নোখ বাড়ে। কাল বিকেলে মিয়াপাড়া গিয়েছিলাম। হাশিম পেশকার এসেছেন দেখলাম। আর দেখলাম চিন্তে দেওয়ানজিকে। ঝড়ে তালপাতার ছাতার অবস্থা। তো পেশকারকে আদাব দিলে বললেন, তুমি ভগীরথের ছেলে না? দ্যাখো তো বাবা, এই নোখটায় কুনকি হল নাকি। ব্যথা করছে। নোখ কাটছি আর শুনছি পেশকার বলছেন, কর্মচারী দলিল চুরি করেছে। থানায় কেস ঠুকে দিন। আড়চোখে দেখলাম, চিন্তে দেওয়ানজি চোখ টিপছেন পেশকারমশাইকে। উনি খেয়াল করলেন না। কথার টানে বললেন, কিসের দলিল? জমিজমার দলিল হলে অসুবিধে নেই। রেজেস্ট্রি অফিসে ফি দিলেই নকল পাবেন। তমসুকি কাগজ হলে অবশ্য গণ্ডগোল। পরচা-পাট্টা হলে কালেক্টরি সেরেস্তা থেকে নকল বের করে দেব। কিন্তু দলিলটা কিসের? ইচ্ছে হল বলি, দলিলটা কিসের। ওস্তাদজি! কথায় বলে নাপিত ধূর্ত। আমার বাবাকে আপনি দেখেননি। বাবার বিদ্যার একটু-আধটু পেয়েছি।'

গুনু কথার শেষে গম্ভীর হল। মজহারউদ্দিন বললেন, 'দলিলটা কিসের তুই জানিস?'

'চৈত্ মাস। এখন হাওয়াবাতাস একটু জোরে বয়। খবরের দোষ নেই।'

'বড্ড কথাবাজ তুই ?'

'আপনার চেয়ে ?' নরসুন্দর রহস্যপূর্ণ হাসল। 'যাক গে ! তা হলে যেতে আজ্ঞা হোক।'

সে ছোট্ট বাকসোটি সামলে-সুমলে উঠে দাঁড়াল। তারপর ওস্তাদের দিকে একবার তাকিয়ে পা বাড়াল। ওস্তাদ ডাকলেন, 'অ্যাই নরসুন্দরের পো !'

সে না ঘুরেই বলল, 'আজ্ঞা হোক !'

'তুইও আমাকে দলিলচোর বলে যাচ্ছিস ?'

গুনু ঘুরে দাঁড়াল। মাথা নুইয়ে জিভ কেটে বলল, 'ছিঃ ! তাই বলতে পারি ? গুরু বাপের চেয়ে বড়। ভেবে দেখুন, কাল অত রাত অব্দি ধরেকেটে মেরেকেটে করলাম। কথাবাজি করিনি।'

'এখন করছিস !'

গুনু ইচ্ছে করেই গলা চড়িয়ে বলল, 'মায়ের পাটায় মেয়েকে বসাবেন। এতে আমার কী, লোকেরই বা কী ? তবে মেয়েটাকে বলবেন, জমিদারবাবুদের রক্তের দোষ আছে। পটিয়ে-পাটিয়ে মাথা খারাপ করে দিয়েছে বটে, কিন্তু এখনও সময় আছে। একটু বুঝিয়ে বলবেন। মায়ের সর্বনাশ করে আথান্তরে ভাসিয়েছিল। মেয়েও যেন ভেসে না যায়।'

গুনু চলে গেলে মজহারউদ্দিন বুঝলেন ঘটনাটি প্রচণ্ড পল্লবিত হয়েছে বীরহাটায়।...

অবশ্য পল্লবিত হয়েছিল বলেই মজহারউদ্দিন খানের ইজ্জত বাঁচে। থানার দারোগা তলব দিতে দুজন সেপাই আর একজন চৌকিদার পাঠান। দারোগাবাবু খান সাহেবের ইজ্জতের দাম না বুঝলেও ইজ্জতের খবর রাখতেন। তাই জমিদারের দেওয়ানজির মুখরক্ষার জন্য নেহাতই তলব। কিন্তু এইটুকুতেই বীরহাটায় সাড়া পড়ে যায় তিনি শুধু ওস্তাদ গায়ক নন, একজন সাধকপুরুষও, এমন একটা জনরব ততদিনে চালু হয়েছে। রাস্তায় তাঁকে দেখলে লোকেরা আদাব দিয়ে রাস্তা থেকে সরে দাঁড়ায়। তার চেয়ে বড় ঘটনা রায়-রায়ান বংশের প্রতি বাবুপাড়ার চাপা ঘৃণা। কিছুটা ঈর্ষাও বাবুপাড়ার আনাচে-কানাচে থকথক করত। চন্দ্রনাথের অস্টিন গাড়িটা ছিল চক্ষুশূল। তাছাড়া গঞ্জ-বাজার জনপদে তিল দেখতে দেখতে তাল হয়। পাটোয়ারিজির গদিতে খবর পৌঁছুলে তিনি ভড়কে যান। চুরির ঘটনা সত্য এবং চুরির মাল তাঁরই জিম্মায় ! সেটি আরও গুপ্তস্থানে চালান করে তিনি বেরিয়ে পড়েন এবং থানা প্রাঙ্গণের প্রান্তে বিশাল

ডুমুর গাছটির তলায় দাঁড়ান, যেখানে উটকো লোকের একটি ভিড় ছিল।

নীলমাধব দারোগা বীরহাটার নাড়িনক্ষত্র চিনতেন। বহুমাত্রিক দ্বন্দ্বের জটিল টানাপোড়েনটি তাঁর ধারণায় মোটামুটি স্পষ্ট ছিল। গণ্যমান্য মানুষদের দেখে তাঁর শ্যাম রাখি না কূল রাখি অবস্থা। তিনি শুধু সহাস্যে বলছিলেন, 'কী কাণ্ড! কী কাণ্ড!'

কাণ্ডটি মজহারউদ্দিন সহসা আরও জটিল করে দেন। তিনি তাঁর নিজস্ব ভঙ্গিতে বলেন, অপরের জিনিস না বলে নিলে সেটা চুরি। তা যদি হয়, তা হলে জমিদারবাবুই চোর। কারণ তিনি অপরের জিনিস না বলে নিয়েছিলেন। এর পর দারোগাবাবুর পাশে গম্ভীর চিন্তামণিকে দেখিয়ে মজহারউদ্দিন বলেন, ওঁকে জিজ্ঞাসা করা হোক, দলিলটি কিসের। দেওয়ানজি নিরুত্তর ছিলেন। তাঁর প্রতি ঝাঁকে ঝাঁকে প্রশ্ন ছুঁড়ে মারা হয়। তবু তিনি চুপ। এতে উত্তেজনা ও রহস্য প্রচণ্ড চাগিয়ে ওঠে। এবার মজহারউদ্দিন বলেন, নিজের জিনিস নিজে নিলে সেটা চুরি করা হয় কি? ওই ডুমুরতলায় পাটোয়ারিজি দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি কারবারি মানুষ। তাঁর গুদাম থেকে তাঁরই হুকুমে মুটেমজুর মানুষেরা যখন খন্দের বস্তা বের করে আনে, তাদের চোর বলা যাবে কি না এটাই মূল প্রশ্ন। পাটোয়ারিজিকে ডাকা হোক এখানে। এই বলে মজহারউদ্দিন ডুমুরতলার দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। পাটোয়ারিজি দৃশ্যগোচর ছিলেন। তখনই দারোগাবাবুর তলব পেয়ে বিব্রতভাবে দরবারে হাজির হন। তখন মজহারউদ্দিন তাঁকে আরও ভড়কে দিয়ে বলেন, পাটোয়ারিজির মহাজনি কারবারও আছে। এলাকার লোকের অসংখ্য তমসুক তাঁর সিন্দুকে আছে। দলিল-কবুলতি পাট্টাও কম নেই। এখন কথা হল, অন্নদামায়ের টাঁড়ের কথা এলাকার সর্বসাধারণ জানেন। বাহান্ন বিঘে মাটির মালিকানা খণ্ডায় কার সাধ্য? রেজেস্ট্রি করা দানপত্র। সবার এও জানা কথা, অন্নদারানী দেব্যা বড়বানের বছর ভেসে যান। তার আগে নিজের মেয়ের নামে যে উইল করে যান, তাও রেজেস্ট্রি করা দলিল। সেই দলিল দুটি পাটোয়ারিজি যদি দয়া করে এনে দেখান, জট খুলে যায়। কে চোর, সেটাও প্রমাণ হয়ে যায়।

বুদ্ধিমান পাটোয়ারিজি তখনই হন্তদন্ত গদিতে গিয়ে বোঁচকাটি নিয়ে আসেন। ততক্ষণে ভিড় আরও বেড়েছে। সেপাই, দফাদার, চৌকিদার লাঠি তুলে তম্বি করছে। দেওয়ানজি গা তোলার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু এস্রাজবাদক মনোহর চাটুজ্যে তাঁকে নড়তে দেননি। পাটোয়ারিজির হাত থেকে বোঁচকাটি নিয়ে মজহারউদ্দিন যত্ন করে খোলেন। তারপর বলেন, দারোগাবাবু অনুমতি দিলে তিনি পড়ে শোনাবেন।

নীলমাধব অনুমতি দেওয়ার আগেই গণ্যমান্যেরা এক গলায় বলেন, 'পড়ুন ! পড়ুন !'

দুটি দলিলই গায়কের উদাত্ত গলায় পঠিত হলে হাসির ধুম পড়ে যায়। একটি পুরনো কেচ্ছা নতুন রঙে ঝকমকিয়ে উঠেছিল। নীলমাধব মুচকি হেসে দেওয়ানজিকে বলেন, 'আপনার মালিককে গিয়ে বলুন, আমি নাচার। পণ্ডিতমশাইয়ের মেয়ের সঙ্গে মিটমাট করে নেওয়াই ভাল।'

দেওয়ানজি চুপচাপ উঠে যান। বোঁচকাটি পাটোয়ারিজির জিম্মায় দিয়ে মজহারউদ্দিন যখন থানা থেকে বেরিয়ে আসছেন, তাঁর পেছনে ভিড়টি বিশালই ছিল। তবে স্তব্ধতা ছিল লক্ষ করার মতো। মনোহর চাটুজ্যে ওস্তাদজির আখড়ায় এসে ফিক করে হেসে বলেন, 'দেবী হোক কি খানকি হোক, চাঁদু শালাকে যে জব্দ করবে আমরা তার দলে। দেবোত্তর নিয়ে আমাদের সঙ্গে তিন পুরুষের মামলা। শালা মোটরগাড়ি দেখাতে আসে ! কলকব্জায় মাকড়শা ছেড়ে দেব, জাল বুনবে। ইঞ্জিনে চামচিকে ঢুকিয়ে দেব, নাদবে। চুপচাপ দেখুন শুধু।'

মজহারউদ্দিন অন্য কথা ভাবছিলেন। এত হইচই হল, ইন্দ্র বা পণ্ডিতের মেয়ের দেখা নেই। জঙ্গলের পাটায় বসতে গেছে কি ? তাই যদি গিয়ে থাকে, ইন্দ্রের ভূমিকাটা জানা দরকার। তাকে পারু অপমান করে তাড়িয়ে দিয়েছে বলছিল।...

॥ ৬ ॥

এদিন প্রজ্ঞার হাতে ত্রিশূল ছিল। সেটা আত্মরক্ষাজনিত সতর্কতা অথবা ইন্দ্র তাকে হাল্কা কৌতুকে বলেছিল জঙ্গলের পাটায় জঙ্গলের দেবীর কথা, কী কারণে তা সে জানে না। এও জানে না যে সে জঙ্গলের পাটায় গিয়ে বসলে সত্যিই মায়ের মতো দেবী হবে কি না, সৌন্দর্য খুলবে কি না। তবে ত্রিশূলটা হাতে নেওয়ায় তার মনে যথেষ্ট নিষ্ঠুরতার উদ্রেক হয়েছিল। নিষ্ঠুরতা এবং অতিরিক্ত সাহসও।

এমন প্রবল সাহস, বাঘটাকে দেখলে সে অকম্পিত পায়ে কাছাকাছি যাবে এবং তার পিঠে চেপে বসবে। আর তখনই সে প্রকৃতই দেবী অরণ্যানী হয়ে উঠবে।

কিছুক্ষণ পরে সে নিজের ইচ্ছা ও কল্পনার বাচালতায় মৃদু হেসে ফেলেছিল। দূরে সরে যাওয়া চারপাশের বাস্তবতাগুলি আবার কাছে ফিরে এসেছিল।

অনাবাদী বিস্তৃত মাঠ, ইতস্তত বিক্ষিপ্ত বৃক্ষলতাগুল্মের উঁচু ও নিচু স্তূপ, দূরের বিল এবং নীল-ধূসর কাশবন বড় বেশি নির্জনতায় আচ্ছন্ন। বাতাসও স্থির হয়ে গেছে কেন, কী ঘটবে সেই প্রতীক্ষা ?

কেদারের নালার ওপারে পৌঁছে অকারণে একবার পিছু ফিরতেই সে চমকে উঠেছিল। দূরে উজ্জ্বল রোদে এক ঘোড়সওয়ার। দেখতে দেখতে ছবিটি মুছে গেল। ইন্দ্র কি তাকে অনুসরণ করছে ? কিংবা আবার প্রজ্ঞা ইচ্ছা ও কল্পনার বাচালতায় আক্রান্ত !

প্রজ্ঞা একটু অপেক্ষা করল। আবার ঘোড়সওয়ারকে দেখা গেল। শূন্যে ধাবমান মনে হয়।

মনেমনে তাকে ডাকতে থাকল প্রজ্ঞা। কেদারের টাঁড়ের জঙ্গলের ওপাশে ধাবমান ঘোড়সওয়ার আবার অদৃশ্য হলে প্রজ্ঞা পা বাড়াল। গতরাত থেকে সে যেন একটা মরীচিকায় আক্রান্ত। মরীচিকাটিকে সে শেষ রাতে ক্রুদ্ধ আঘাত করেছিল। তবু তা তার পিছু ছাড়ছে না। আবার তাকে দেখা গেল বিলের ধারে সমতল ঘাসের মাঠে। সহসা স্থির হয়ে গেছে। প্রজ্ঞাকে দেখছে।

প্রজ্ঞা আবার মনেমনে তাকে ডাকতে থাকল। কিন্তু আবার ছবিটি কাঁপতে কাঁপতে দূরে মিলিয়ে গেল।

উঁচু হাতিঘাসের জঙ্গল চিরে যে পায়েচলা রাস্তাটি নিচু বাঁধে গিয়ে উঠেছে, সেই রাস্তায় হাঁটতে থাকল প্রজ্ঞা। আর একবারও পিছনে কি ডাইনে-বাঁয়ে নয়, দৃষ্টি সামনে। সে কি আশা করছিল ওই অলীক ঘোড়সওয়ারকে এবার সামনেই দেখতে পাবে, তার জন্য প্রতীক্ষারত ? সে জানে না। অথচ একটা আকুল প্রত্যাশা তাকে অস্থির করেছিল, এটা ঠিকই।

নিচু বাঁধটির দুধারে ঘন কুলবন। এই বাঁধের ওপর দিয়ে বাঁদিকে হেঁটে গেলে নাথুরামদের বাথান, ডাইনে হেঁটে গেলে ফুলন্ত পলাশ ঝোপে ঢাকা একটা মাঠ। মাঠের শেষে অন্নদারানী সবুজ চোখে তাকিয়ে মেয়েকে আসতে দেখছিল। মেয়ের চোখে তখনও মরীচিকার ঘোর। বনান্তর থেকে প্রান্তরে, দূরে এক ঘোড়সওয়ার।

পলাশঝোপের ভেতর থেকে এতক্ষণ কালো আঁটোসাঁটো গড়নের মেয়েটিকে উঠে দাঁড়াতে দেখে প্রজ্ঞার ঘোর কেটে গেল। সে ত্রিশূলটি উঁচুতে তুলে নাড়া দিল এবং ডাকল, 'আলো !'

শশ বাগদির মেয়ে আলো বলেছিল, বাবুদিদিকে সে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবে। কথামতো সে এসে ঠিক জায়গায় অপেক্ষা করছিল। প্রজ্ঞার হাতে

ত্রিশূল দেখে সে খুব হাসতে লাগল। প্রশংসা করে বলল, খুব মানিয়েছে বাবুদিদিকে। দেবীর মেয়ে, সেও এক দেবী। তার হাতে ত্রিশূল ছাড়া আর কীই বা মানায় ? তারপর মাথা নুইয়ে করযোড়ে দণ্ডবতও করল। তার হাতে একটি লম্বাটে চকচকে হেসো ছিল। হেসোটি সহ দণ্ডবত। যেন একটি রক্তাক্ত হত্যার জন্য অনুমতি প্রার্থনা।

প্রজ্ঞা জানতে চাইল তার হাতে অস্ত্র কেন ?

আলো আগে হাঁটছিল, প্রজ্ঞা পেছনে। প্রজ্ঞার প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, যার হাতে যা মানায়। সে তো বামুনবাড়ির মেয়ে নয়, সে বাগদিকন্যা। তার বাবার একসময় ডাকাত আর লাঠিয়াল বলে বদনাম ছিল। এমন মানুষের মেয়ে জলে জঙ্গলে হেসো হাতে ঘুরে বেড়াবে, সেটা একটা সহজ কথা। তবে কঠিন কথাটি হল, তার দিকে অনেক লোকের চোখ আছে। কেন না, তার মতো গরিব মেয়েদের যৌবন একটা সাংঘাতিক দোষ। আলো কথায় কথায় হাসে। হাসির পর আবার বলল, খালেবিলে মাছ ধরতে না বেরুলে তাদের মুখের অন্ন জুটবে না। বাগদিমেয়েদের তো এটাই আসল কাজ। কিন্তু তার বেলায় একটা উটকো ঝামেলা আছে। স্বামীর বুকে লাথি মেরে চলে এসেছে, সে প্রায় বছরদুয়েক হতে চলল। লোকটা তখন মাতাল অবস্থায় ছিল। কিন্তু সেও এক লাঠিয়াল। বীরহাটার জমিদারবাবুদের বাড়িতে বরকন্দাজি করে। সেখানেই থাকে। একটা মাগও জুটিয়েছে শোনা যায়। তবু তার বড় লোভ শেতলদ'র এই কালো মেয়েটার ওপর। মাঝে মাঝে বাতাসে খবর আসে, তাকে ধরে নিয়ে যাবে। সত্যিমিথ্যা বলা কঠিন, কিন্তু সাবধানে থাকা উচিত।

প্রজ্ঞা ঈষৎ কৌতুকে বলল, 'নাম কী লোকটার ?'

আলো বাঁহাত তুলে বলল, 'বুঝুন, যদি বুঝতে পারেন। আঙুল গুনলেই হল।'

প্রজ্ঞা বলল, 'ভুলে গিয়েছিলাম। স্বামীর নাম বলতে নেই। কিন্তু তুমি কি পাঁচুর কথা বলছ ?'

আলো হাসতে থাকল। প্রজ্ঞা গম্ভীর হয়ে রইল কিছুক্ষণ। পলাশবনের মাঠটার শেষে হঠাৎ বলল, 'তোমার নাম আলো কেন জানো ?'

কেন আবার ?' আলো ভাঙা খোঁপা গুছিয়ে বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'বাবা-মা ভেবেছিল, যদি কালো রঙখানা আলোর নামে জ্বলেপুড়ে যায়।'

'উঁহু। আমি বলব কেন তোমার নাম আলো ?'

'বলুন তবে শুনি।'

'তোমার হাসিতে তোমার কালে রঙ ফর্সা হয়ে যায় বলে।'

'তা বাবুদিদি, কপালগুণে হাসতে আমি পারি বটে। আমার সবেতেই হাসি পায়।'

প্রজ্ঞা একটু ইতস্তত করে বলল, 'তোমার ছেলেপুলে নেই, আলো?'

আলো থমকে দাঁড়িয়ে গেল এবং আবার অস্থির হেসে বলল, 'আমি বাঁজা গাছ গো বাবুদিদি! এ গাছে ফল ধরবে না।'

'যাঃ! কেমন করে জানলে?'

'জানা যায়। পাঁচ বছর লোকটার ঘর করেছি। দু'বছর ছাড়াছাড়ি। তা হলে সাত বছর হয়। কেমন তো?' আলো মুখে হাসি রেখে শ্বাসপ্রশ্বাসে জড়িয়ে বলল, 'এ দু'বছর না হয় বাদ থাক। পাঁচটা বছর তো কম নয়। ওদিকে আপনি খবর নিন। জমিদারবাড়িতে যখন থাকেন, খবর পেয়ে যাবেন।'

'কী খবর?'

আলো পা বাড়িয়ে বলল, 'ছেলের বাপ হয়েছে, সেই খবর।'

প্রজ্ঞা ভাবছিল, এই মেয়েটিকে প্রথমদিন যা ভেবেছিল, সে সত্যিই তা নয়। এর অনর্গল হাসির তলায় দুঃখের পাথর পড়ে আছে। তলায় পাথর পড়ে থাকলে নদীর কী রূপ হয়, প্রজ্ঞা দেখেছে।

মায়ের মাটিতে পা দিলে প্রজ্ঞার অন্যমনস্কতা মুছে গেল। বলল, 'আচ্ছা আলো!'

'বলুন বাবুদিদি!'

'তুমি আমাকে একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবে বলেছিলে!'

'আপনি ভাবছেন মিথ্যা?'

'না কিন্তু জিনিসটা কী?'

'আসুন তো!'

আজ বাতাস বন্ধ। পাখি আর পোকামাকড়ের ডাক নৈঃশব্দ্যেরই আরেক রূপ মনে হয়। শুকনো পাতার স্তূপ সবখানে। আলো দ্রুত হাঁটছিল। শুকনো পাতায় একটা ব্যগ্রতার শব্দ। যেতে যেতে প্রজ্ঞা একবার ডাইনে ঘুরেছিল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে প্রসারিত মাঠ এবং সহসা সেই মাঠের প্রান্তে সেই ঘোড়সওয়ার চিত্রবৎ স্থির। প্রজ্ঞা থমকে দাঁড়িয়েছিল। তারপর আলোর ডাক শুনল, 'কী হল বাবুদিদি! আসুন।' তখন সে হাঁটতে থাকল। সত্যিই কি ইন্দ্র তাকে কেন্দ্র করে ছুটে বেড়াচ্ছে, অথবা সেই মরীচিকা?

অনেকটা চলার পর জঙ্গলের মাটি ঢালু হয়েছে। ঢালু অংশটা লালচে। ঘন

ঝোপে ঢাকা। ঝোপে অজস্র লতার ঝালর। আলো হেসো তুলতেই প্রজ্ঞা চেঁচিয়ে উঠল, 'না, না!'

আলো অবাক হয়ে বলল, 'কী হল বাবুদিদি? দেখবেন না?'

প্রজ্ঞা কাছে বলল, 'তুমি ঝোপ কাটতে যাচ্ছিলে! কেটো না। আমার কষ্ট হবে।'

আলো হেসে উঠল। 'ঝোপ না কাটলে দেখবেন কী করে? আর ওই যে বললেন, কষ্ট হবে। বেশ। কষ্ট যদি হবে, তা হলে এই জঙ্গল আবাদ করাবেন কী করে' সে হেসোটা মাটিতে রেখে কোমরে আঁচল জড়াতে থাকল। 'বাবুদিদি, আপনার কথা বুঝি না গো! এই গাঁ সেই গাঁ কত লোক দিন গুনছে, কবে বাবুদিদি এই মাটিতে আবাদ করাবে। আর এখন বলছেন কেটো না। জঙ্গল না কাটলে আবাদ হবে কী করে?'

প্রজ্ঞা কী বলবে ভেবে পেল না। আলোর দিকে তাকিয়ে রইল। দৃষ্টিতে কাতরতা ছিল।

আলো বলল, 'বেশ। তবে কাপড়খানা এমনি করে সামলে আসুন। সবটুকু দেখা যাবে না। যেটুকু দেখবেন, তাতেই কাজ হবে। আসুন!'

সে হেসোটির সাহায্যে ঝোপ ফাঁক করে কয়েকপা এগোল। প্রজ্ঞা তার পেছনে। সামনের ঝোপটা একটু ঠেলে দিয়ে আলো বলল, 'ওই দেখুন।'

প্রজ্ঞা দেখতে পেল। ইটের জমাট চাবড়া এবং একটি হাত দেড়েক উঁচু থাম। পলেস্তারা নেই। সে আলোর পাশ দিয়ে ঝোপ ঠেলে এগিয়ে ভাঙা থামটিকে প্রথমে ত্রিশূল দিয়ে ছুঁল। তার শরীর শিউরে উঠল। তারপর সে কয়েক পা বাড়িয়ে হাত দিয়ে ছুঁল। এবার সে কাঁপতে কাঁপতে ইটের চাবড়াটির ওপর ঝুঁকে মাথা ঠেকাল। সে নিঃশব্দে কাঁদছিল। তার পিঠ কেঁপে-কেঁপে উঠছিল।

আলো ব্যস্তভাবে বলল, 'কী হল বাবুদিদি? কী হল আপনার?'

একটু পরে প্রজ্ঞা চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল। মুখে কেমন একটা হাসি। 'আলো! আমার মায়ের মন্দির ছিল এখানে।' আচ্ছন্ন কণ্ঠস্বরে সে বলতে থাকল, 'এই মন্দিরের কথা বাবার কাছে শুনেছিলাম। বাবা বলতেন, থামওয়ালা মন্দির। চারদিক খোলা। মাঝখানে একটা বেদী। বেদীতে মা বসলে দেবীর ভর হত। আর জানো আলো? বাথানের নাথুরামও বলেছিল, থামের মাথায় ছাদ। মাঝখানে বেদী। বড়বানের বছর নদী সব ভেঙেচুরে নিয়ে যায়। আমার মাকেও

নিয়ে গিয়েছিল, তুমি কি শুনেছ আলো ?'

আলো বলল, 'শুনেছি বাবুদিদি ! তার পরের বছর আমার জন্ম। তবে কথা কী, ঝোপঝাড় জায়গা। পোকামাকড় থাকতে পারে। সরে আসুন। ওই ফাঁকা জায়গায় গিয়ে দাঁড়াই এবার।'

একটা প্রকাণ্ড হিজলগাছের তলায় দাঁড়িয়ে আলো বলতে থাকল, কবে এবং কীভাবে ওই ইটের চাবড়া আর ভাঙা থামটি সে আবিষ্কার করেছিল। সে তার কিশোরী বয়সের কথা। বৈঁচি আর কুঁচফল সংগ্রহে এসে সে অজস্র ইট, ইটের চাবড়া আর থামটি দেখতে পেয়েছিল। কথাটি সে কাউকে বলেনি এতকাল। কেন বলেনি, সে-কথা জানতে হলে তার মায়ের কাছে যেতে হয়। কিন্তু সেও একটা সমস্যা। তার মায়ের কাছে যেতে হলে মৃত্যু ছাড়া যাওয়ার রাস্তা নেই। অবশ্য বেঁচে থাকার উপায় ছিল না তার মায়ের। মাছ ধরতে গিয়ে গর্তে হাত ভরেছিল, এমনই বোকা ছিল শশ বাগদির বউ। নিয়ম হল, আগে কঞ্চি বা ডাল ভেঙে গর্তের ভেতরটা দেখে নিতে হয়। আলো হাসতে হাসতেই সাপের কামড়ে তার মায়ের মৃত্যুর একটা বিবরণ দিল। তারপর শ্বাস টেনে বলল, 'মা আমাকে বলেছিল, দেবী লুকিয়ে আছেন। যে লুকিয়ে আছে, তার কথা কাউকে বলতে নেই। তাই বলিনি।'

প্রজ্ঞা আস্তে বলল, 'কেন ওকথা বলেছিল তোমার মা ?'

আসলে সে একটা ব্যাখ্যা চাইছিল আলোর কাছে। আলো মিটিমিটি হেসে বলল, 'সেই তো বলছি বাবুদিদি ! কেন বলেছিল, জানতে হলে মায়ের কাছে যেতে হয়।'

প্রজ্ঞা ঠোঁট কামড়ে ধরে চুপ করে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, 'আমি বুঝতে পারছি, আলো !'

'আপনি দেবীর মেয়ে, আপনিও এক দেবী। পারলেও পারেন বৈকি !' আলো কাপড় থেকে একটা পোকা ঝেড়ে ফেলে বলল, 'তা হলে বলুন শুনি।'

প্রজ্ঞা শীতল কণ্ঠস্বরে বলল, 'এই মাটিটাকে লোকে খানকির টাঁড় বলে, তুমি নিশ্চয় জানো।'

আলো একটু চমকে উঠে বলল, 'ছিঃ ! ও কী কথা বাবুদিদি ? ছোটলোকের ছোট মুখ। তারা বলতে পারে।'

'আলো ! তোমার মা হয়তো চায়নি এখানে আবার পুজো হোক কি লোকেরা এসে মানত দিক। এই খানকির টাঁড়ে...' প্রজ্ঞা থেমে গেল। উত্তেজনায় তার মুখ লাল হয়ে উঠেছিল।

'সে কী কথা ?' আলো ভুরু কুঁচকে তাকাল। 'আপনি এমন কথা কেন বলছেন বাবুদিদি ?'

'তোমার মায়ের কাছে আমার মা দেবী ছিলেন না, আলো !'

এবার আলো হাসতে লাগল। 'মনে হয় কী, আপনারও ভর উঠেছে। ভরের সময় কতরকম কথা মানুষের মুখ দিয়ে আসে। সব কথা বোঝাই যায় না। দেবতার কথা। বোঝে কার সাধ্যি ?'

প্রজ্ঞা আত্মসম্বরণ করল। সে বুঝতে পেরেছিল, একজন মৃত স্ত্রীলোককে বড় অকারণ সন্দেহ করছে। চুল এবং কাপড় থেকে শুকনো পাতা ঝেড়ে ফেলে সে একটু হাসল। 'তুমি কি এ কথা শুনে আমার ওপর রাগ করলে, আলো ? আমার ভাবনা হচ্ছে। তুমি হাসি দিয়ে সবকিছু চাপা দিতে পারো।'

আলোর মুখের হাসি হঠাৎ মুছে গেল। আস্তে বলল, 'তা হলে বলব, মাকে দেবীর শাপ লেগেছিল। তাই মাকে সাপে দংশেছিল।'

প্রজ্ঞা নিঃসংকোচে আলোর একটা হাত হাতে নিল। 'ওসব কথা থাক। তুমি আমাকে সত্যিই একটা আশ্চর্য জিনিস দেখিয়েছ। দেখ আলো, এতদিন ধরে এই জঙ্গলে আসছি। সবখানে ঘুরেছি। অথচ ভাবতেও পারিনি, মায়ের মন্দিরের চিহ্ন এখানে লুকিয়ে আছে। তোমাকে আমি সাধ্যমত বখশিস দেব, আলো !'

'এই তো ! এবার সত্যি আর হাসতে পারব না, বাবুদিদি !' আলো মুখে একটা কষ্টের ছাপ আনল। 'বকশিসের লোভে কি আপনাকে···ছি, ছি ! আমি ছোটলোকের বাড়ির মেয়ে। পেটের খাবার আর পরনের কাপড়ের বড় কষ্ট। তাই বলে দেবীর মেয়েকে দেবীদর্শন করাতে বকশিস ? ও কথা মুখে আনবেন না বাবুদিদি !'

সে প্রজ্ঞার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে দ্রুত পায়ের কাছ থেকে হেসোটি তুলে নিল। তারপর বলল, 'আমি যাই।' এবং হনহন করে এগিয়ে গেল।

প্রজ্ঞা ডাকল, 'আলো ! আলো ! এ কী হচ্ছে !'

আলো পিছু ফিরল না। জঙ্গলের ভেতর উধাও হয়ে গেল। প্রজ্ঞা দুঃখিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল। মজহারউদ্দিন বলেছিলেন, এই জলজঙ্গল এলাকার মানুষজনের মতিগতি বোঝা দায়। কোন কথাটা কীভাবে নেবে বোঝা কঠিন। ঠিক তাই হল। বখশিসের কথায় আলো অমন চটে গেল কেন ? নাকি মনগড়া করে বলা মায়ের ধারণাটার কথা তোলা ভুল হয়েছে ? সত্যিই তো, সব মেয়েই মৃতা মা সম্পর্কে কোনও মন্দ আভাস দিলে দুঃখ পায়।

প্রজ্ঞা চাপা শ্বাস ফেলে ডাইনে ঘুরেই দেখল, গাছপালার ফাঁকে একটি বাদামি

রঙের ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। তার পিঠে কোনও লোক নেই। মরীচিকা! এবার তুমি এত কাছাকাছি?

কয়েক পা এগিয়ে লোকটিকে দেখা গেল। মাটির প্রায় সমান্তরাল একটা নিচু ডালে বসে আছে। জুতো মাটিতে ঠেকেছে। বন্দুকের কুঁদো দুই উরুর ওপর। আলগোছে আগ্নেয়াস্ত্রটা ধরে আছে সে।

প্রজ্ঞা শুকনো পাতায় আর্তনাদের শব্দ তুলতে তুলতে ছুটে গেল। সে ডাকছিল, 'ইন্দ্র! ইন্দ্র! ইন্দ্র!' পাখি যেমন করে গাছের দিকে উড়ে যায়, প্রজ্ঞার মধ্যে সেই গতি ও ব্যাকুলতা ছিল।...

মজহারউদ্দিনের এদিন কী খেয়াল, সূর্যাস্তকালে সহসা আত্মসমর্পণের তীব্র ইচ্ছা, যার জন্য সঙ্গীত যথেষ্ট নয় ভেবে নদীর চড়ায় নামাজ পড়ছিলেন। কোনও-কোনও সময়ে অদৃশ্য কারও উদ্দেশে শরীর লুটিয়ে অবনত হলে চিত্তে গভীরতর প্রশান্তি আসে। কিন্তু করযোড়ে প্রার্থনার সময় তাঁর একাগ্রতা ব্যাহত হয়েছিল। পেছনে আবছা শব্দ।

কোনও মতে প্রার্থনা সেরে পিছু ফিরলেন। মুখে স্মিত হাসি ফুটে উঠল কয়েক মুহূর্তের জন্য। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গম্ভীর হয়ে তাকিয়ে রইলেন। তখনও পা দুটো খালি। জুতো একটু তফাতে রাখা আছে।

ইন্দ্র ঘোড়ার জিন থেকে প্রজ্ঞাকে দুহাতে লুফে নেওয়ার ভঙ্গিতে নামতে সাহায্য করছিল। প্রজ্ঞা ইচ্ছে করেই তার করতলগত হল। মুখে বালিকার চপলতা ছিল। সে মজহারউদ্দিনের অস্তিত্ব ভুলে গিয়ে স্বচ্ছ জলের দিকে ঝুঁকল। মুখে জলের ঝাপটা দিতে থাকল।

মজহারউদ্দিন ভাবছিলেন, ঈশ্বরের কাছে আত্মসমর্পণের চেয়ে পুরুষের কাছে নারীর আত্মসমর্পণের তীব্রতা বেশি না কম?

'আদাব চাচা!' ইন্দ্র কপালে হাত ঠেকিয়ে ঘোড়াটিকে টানতে টানতে কাছে এল। 'আপনাকে কেমন যেন দেখাচ্ছে?'

মজহারউদ্দিন শাদা টুপিটি পাঞ্জাবির পকেটে ঢুকিয়ে ধুতির কাছাটি সামনের দিক থেকে খুলে যথাস্থানে গুঁজে দিলেন। কাছাটি তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে ভাঁজ করেছিলেন। নাগরা জুতোয় পা গলিয়ে বললেন, 'খোদার দুনিয়ায় দিনের পর রাত, রাতের পর দিন আসাটাই নিয়ম। ওই দ্যাখ, সূর্য ডুবে গেছে।'

'আমি অন্ধকারেও সব স্পষ্ট দেখতে পাই চাচা! কিন্তু এখনও যথেষ্ট আলো।'

মজহারউদ্দিন অনিচ্ছাসত্ত্বেও একটু হাসলেন। 'ঝড়পানি দুনিয়ার মাটিতে অনেক চিহ্ন রেখে যায়। আজ বীরহাটায় একটা ঝড়পানির দিন ছিল। তোরা জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরিস। দুনিয়াদারি অন্য জায়গা। এখানে হরেক ঝকমারি।' একটু চুপ করে থাকার পর তখনও জলে আনত প্রজ্ঞাকে দেখতে দেখতে আবার বললেন, 'তোর বাবার চেয়ে চিন্তেশালা এককাঠি সরেস। ভেবেছিল, বন্দুকের ফাঁকা আওয়াজ দিয়ে ভূত তাড়াবে। কিন্তু এ ভূত সহজ ভূত নয়, সাক্ষাৎ মামদো।'

ইন্দ্র উদ্বিগ্ন মুখে বলল, 'কিছু কি ঘটেছে?

'হিতে বিপরীত। বাবাকে বলিস, চিন্তেই সর্বনাশ করে ছাড়বে।'

ইন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠল। 'আসল কথাটা কী?'

হাসলেন মজহারউদ্দিন। শুকনো খটখটে একটা হাসি। 'দলিলচোর বলে আমার কোমরে দড়ি পরাতে চেয়েছিল। চারদিক তোলপাড় হুলুস্থুলু, সে এক ঝড়পানি। থানা থেকে মুখ চুন করে ফিরে গেল। শয়ে শয়ে লোক জেনে গেল অন্নদামায়ের বাহান্নবিঘে মাটির খবর। জেনে গেল, তোর ঠাকুর্দা দেবীকে ফেলে পালিয়ে এলেও দেবীর পাটা যেখানকার সেখানেই থেকে গেছে। সেই খালি পাটায় দেবীর মেয়ে ছাড়া বসবে, কার সাধ্য?' আবার আনত প্রজ্ঞাকে লক্ষ করে বললেন, 'দলিলগুলো আমি খুব জোরে-জোরে পড়েছি। সাধা গলা। ইচ্ছে করলে মেঘের হাঁকও হাঁকতে পারি।'

'বুঝলাম।' ইন্দ্র অন্যমনস্কভাবে বলল।

'সবটুকু বুঝিসনি।' মজহারউদ্দিন আস্তে বললেন। 'তোকে বলেছিলাম জঙ্গলের দেবী গিয়ে আপন পাটায় বসলে মাহাত্ম্য খুলবে। এখন আর গত্যন্তর নেই। বীরহাটার বাবুরা আমাকে ঠাঁই দিতে রাজি, অন্নদারানীর মেয়েকে নয়। এ বড় আমুদে হুল্লোড়বাজের জায়গা। সবতাতেই হুজুগে মেতে ওঠে। আবার উদ্ভট্টে নীতিজ্ঞানও বেশ টনটনে। আসলে সবাই খুশি যে, জমিদারকে জব্দ করা হল। ব্যস! এই পর্যন্ত।'

প্রজ্ঞা জল থেকে উঠে এসে বলল, 'অন্নদারানীর মেয়ে বীরহাটার কাছে ঠাঁই চাইতে যাবে কোন দুঃখে?'

মজহারউদ্দিন বললেন, 'চ্যাটাং চ্যাটাং কথা খালি। সারাটা দিন জঙ্গলে কাটিয়ে এসে যত্ন করে মুখখানা তো ধুয়েছিস। স্বীকার করছি, মুখের জেল্লা খোলতাই হয়েছে। পানি মানুষের গায়ের ধুলোময়লা ধুয়ে সাফ করে দেয়। কিন্তু মনের ধুলোময়লা সাফ করতে...'

প্রজ্ঞা তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'আমার মনে কোনও পাপ নেই।'

'নেই ?' মজহারউদ্দিন কয়েক পা এগিয়ে ইন্দ্রের কাঁধে হাত রাখলেন। 'ধর, কথার কথাই বলছি। এই ইন্দ্র যদি তোকে আজ রাতেই স্ত্রীর ইজ্জত দিয়ে তার ঘরে তুলতে চায়, পারবি যেতে ? পারবি না।'

ইন্দ্র কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল। বলল না। প্রজ্ঞা মুখ নামিয়ে বলল, 'এসব কথা কেন ?'

'তোর আত্মায় তোর মা ভর করে আছেন। তোকে খেলাচ্ছেন। তুই খেলছিস। তোর মায়ের খেলোয়াড়ি হাত থেমে গেলে দেখবি তুই কোথায় আছিস। এই যে এখন তুই পা বাড়াতে তৈরি। কিন্তু কোথায় পৌঁছুবি জানিস কি ?'

প্রজ্ঞা জেদ ধরেই পা বাড়াল। মজহারউদ্দিন তাকে অনুসরণ করছিলেন। ইন্দ্র তখনও চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে। ঢালু পাড়ের কাছাকাছি গিয়ে প্রজ্ঞা ঘুরল। ঝাঁঝালো গলায় বলল, 'আমি হেঁয়ালি বুঝি না।'

মজহারউদ্দিন হাসলেন। 'সব কথা সিধে করে বললে মানে দাঁড়ায় না। তুই পণ্ডিতের বেটি। তোর কাছেও সব হেঁয়ালি ঠেকছে ? ঠিক আছে। তো কথা সিধে করে দিই। এমন করে তুই যাচ্ছিস কোথায় ? তোর ঘর এখন থেকে রাস্তা বল রাস্তা। জঙ্গল বল জঙ্গল।'

প্রজ্ঞা স্থির হয়ে গেল কয়েকমুহূর্তের জন্য। তারপর শ্বাসপ্রশ্বাসের সঙ্গে বলল, 'আমাদের জিনিসপত্র ঘর থেকে বের করে দিয়েছে তো ?'

'হুঁউ। বুঝেছিস তা হলে। তবে ভাবিস না। সব লটবহর উপযুক্ত লোকের জিম্মায় আছে।'

ইন্দ্র শুনতে পেয়ে এগিয়ে এল। শিক্ষিত ঘোড়াটি তাকে অনুসরণ করছিল। ইন্দ্র বলল, 'জিনিসপত্র বের করে দিয়েছে পারুর ?' সে প্রায় গর্জন করে উঠল, 'কে বের করে দিয়েছে ?'

মজহারউদ্দিন হাত তুলে তাকে থামিয়ে দিলেন ! 'তুই তো জমিদার নোস। তোর বাপ জমিদার। তাঁর হুকুমে সব কাজ হয়। এবার আমার ওপরও হুকুম জারি হতে দেরির কথা নয়। কারণ আমার বসতও তোর বাপের জায়গায়। তবে ওস্তাদজির মেহেরবানিতে আমার খানিক ধান্দাবাজিও আছে।' বলে দু'কানের লতি ছুঁলেন। মিটিমিটি হেসে আবার বললেন, 'চৌধুরিমশাই জানেন, তাঁর আরেক ইজ্জত আমার জিম্মায়। কাজেই পাল্টা কোনও ফিকির তাঁকে খুঁজতে হবে।'

ঢালু পাড় বেয়ে কাঁধে পৌঁছে ইন্দ্র তার ঘোড়ার চোয়ালে হাত রেখে বলল, 'বাবা আছেন, না চলে গেছেন জানেন ?'

'একটা কিছু হেস্তনেস্ত না করে যাওয়া চলে ? বীরহাটা জুড়ে ঢিঢি।'

ইন্দ্র ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বলল, 'কিসের হেস্তনেস্ত ? পারুর মাটি কি গায়ের জোরে দখল করবেন নাকি ?'

'জমিদারদের সেটাই কাজ। ইংরেজি জমানা ওঁদের হাতে হুঁকো খাবে বলেই মাটির তখতে বসিয়েছে।' বলে মজহারউদ্দিন প্রজ্ঞার দিকে ঘুরলেন। 'পণ্ডিতের বেটিকে একটা কথা বলার আছে। হ্যাঁরে রে, যদি আদালত তোকে তলব করে বলে, তুমিই অন্নদারানীর মেয়ে, তার প্রমাণ কী ?'

প্রজ্ঞার চোখদুটি আবছা আঁধারে জ্বলে উঠল। 'বড় অদ্ভুত কথা !'

'বেটি ! অদ্ভুত-অদ্ভুত কথার নামই হল গিয়ে আইন। সেই আইন নিয়েই এত মামলা-মোকর্দমা। ইংরেজের এই গ্যাঁড়াকলে তামাম দেশ আটকে গেছে। আমিই যে আমি, কোনও-কোনও সময়ে তা প্রমাণ করতে জেরবার হয় মানুষ।'

প্রজ্ঞা গলার ভেতর বলল, 'প্রমাণের অভাব হবে না। মোতিহারির সবাই জানে কে আমার মা, আমি কার মেয়ে।'

ইন্দ্র সহসা ঘোড়ার পিঠে উঠে বসল। 'আপনারা আসুন। বাবার সঙ্গে হেস্তনেস্তটা আমিই করে নিই।'

মজহারউদ্দিন ধমক দিয়ে বললেন, 'তুই জংলি ছেলে ইন্দ্র ! সারা দুনিয়াটাকে জঙ্গল ভাবিস। তবে মানুষ তার বুদ্ধির জোরে দুনিয়ার জঙ্গলে বাদশাহি করে।'

ইন্দ্রর ঘোড়া ইন্দ্রের মতোই গতির সীমান্তে পা রেখে তৈরি। টানটান ধনুকের ছিলায় ক্ষেপনোন্মুখ একটি তীক্ষ্ণাগ্র বাণ। প্রজ্ঞা ডাকল, 'ইন্দ্র !'

ক্ষেপনোন্মুখ তীক্ষ্ণাগ্র বাণের ভাষায় ইন্দ্র বলল, 'কী ?'

'আমার ইচ্ছে নয় তুমি তোমার বাবার সঙ্গে ঝগড়া করো।'

'কিন্তু এ তো অন্যায় !'

'সে-লড়াই আমার। তুমি এতে নিজেকে জড়িও না।'

ইন্দ্র শ্বাসপ্রশ্বাসের মধ্যে বলল, 'তুমিই আমাকে জড়িয়েছ !' তার কণ্ঠস্বরে তীব্র অভিমান ছিল।

প্রজ্ঞা আস্তে বলল, 'আমার কোনও উপায় ছিল না। কিন্তু আমি কখনই চাইনি তুমি তোমার বাবার সঙ্গে মুখোমুখি ঝগড়া করো। না ইন্দ্র ! তুমি যা করতে যাচ্ছ, তা তোমাকে মানায় না।'

ইন্দ্র একটু চুপ করে থেকে বলল, 'তা হলে···মজহারচাচা যে কথাটা

বলছিলেন, আমি যদি তা-ই বলি ? যদি বলি, তোমাকে সঙ্গে নিয়েই বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চাই, তুমি এস ?'

'এখনও তার সময় হয়নি, ইন্দ্র !'

ইন্দ্র ক্ষুব্ধভাবে বলল, 'কবে সে সময় হবে ? আজ সারাটা দিন তুমি বারবার একই কথা বলছ ! সময় সময় সময় !'

'ইন্দ্র, তুমি বড় অবুঝ।'

ইন্দ্রের ঘোড়া সামনের দুই পা শূন্যে তুলে হ্রেষাধ্বনি করল। ঘোড়াটি বিপরীতমুখী হচ্ছিল, যেদিক থেকে এসেছে সেইদিকে। মজহারউদ্দিন হেসে উঠলেন। 'জঙ্গলে ফেরত যাবি নাকি রে ?'

ইন্দ্রের ঘোড়া কদমে হাঁটতে থাকল। ঈষৎ নাচের ছন্দ ছিল তার গতিতে। মজহারউদ্দিন প্রজ্ঞার দিকে ঘুরে বললেন, 'তুই জুলুমবাজ মেয়ে রে ! ওকে জঙ্গলে ফেরত পাঠাস নে। ডেকে নে।'

ততক্ষণে ঢালু ঘাসেঢাকা পাড় বেয়ে ইন্দ্র নদীগর্ভে পৌঁছে গেছে। প্রজ্ঞা তাকে ডাকল না। যেন কিছুই ঘটেনি এমন ডঙ্গিতে বলল, "ইন্দ্র আমাকে পৌঁছে দিতে এসেছিল। নাথুরামরা বাঘটার ভয়ে তটস্থ।'

'বাথানপাহারার উপযুক্ত লোক পেয়েছে বটে।'

নদীগর্ভে আবছা অন্ধকারে অদ্ভুত শব্দ। ইন্দ্রের ঘোড়া ছুটে চলেছে। মজহারউদ্দিন সকৌতুকে ফের বললেন, 'বাঘটা দেবী অরণ্যানীর বাহন। ইন্দ্র যদি তাকে গুলি করে মারে, তোর কষ্ট হবে না ?'

'ইন্দ্রের সাধ্য কী তাকে মারে ?'

'ঠিক বলেছিস।' মজহারউদ্দিন পা বাড়ালেন। গুনগুন করে একটা সুর ভাঁজতে থাকলেন।

বাঁধের নীচে আলরাস্তায় পৌঁছে প্রজ্ঞা বলল, 'চাচা ! আজ জঙ্গলের ভেতর মায়ের সেই মন্দিরটার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছি।'

মজহারউদ্দিন সুরটা থামিয়ে বললেন, 'বলিস কী ?'

'শেতলদ'র শশর মেয়ে আলো আমাকে বলেছিল একটা আশ্চর্য জিনিস দেখাবে। দেখাল।'

'কী দেখাল ?'

'ঝোপের ভেতর ইটের চাবড়া, একটা ভাঙা থাম। আমি সেখানে ত্রিশূলটা পুঁতে রেখে এসেছি।'

'খুব ভাল খবর। কারণ তুই এবার তোর মায়ের জঙ্গল দখল করলি। ওই

ত্রিশূল তোর দখলদারির চিহ্ন। কিন্তু তারপর ?'

'তারপর আর কী ? ওখানে আপাতত খড়-বাঁশ দিয়ে একটা ঘর তৈরি করে নেব।'

'জঙ্গলের পাটায় বসবি। এও সুখবর। কিন্তু...'

'কিন্তু কী ? আর কোনও কিন্তু-টিন্তু নেই।'

'একা থাকতে পারবি জঙ্গলে ?' বলেই মজহারউদ্দিন হেসে উঠলেন। 'না। পারবি। এক বন্দুকবাজ তোর দারোয়ানি করবে।'

প্রজ্ঞাও হাসতে লাগল। 'করবে। জানেন ? আজ সকালে যখন মায়ের কাছে যাচ্ছি, দেখি কী, ইন্দ্র দূর থেকে আমাকে পাহারা দিচ্ছে। প্রথমে ভেবেছিলাম, চোখের ভুল। পরে মুখোমুখি দেখা হল।'

'হুঁ। কিন্তু পেটে দানাপানি পড়েছে কি না বল্।'

'দুপুরে নাথুরামদের বাথানে গেলাম। বনভোজন হল। রাত্তিরে আর কিছু পেটে সইবে না।'

মজহারউদ্দিন আবার গুন গুন করে সেই সুরটা ভাঁজতে থাকলেন। কিছুক্ষণ পরে প্রজ্ঞা লক্ষ করল, তারা বীরহাটার বাজার এলাকার দিকেই চলেছে। সে বলল, 'এদিকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন আমাকে ?'

মজহারউদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আঃ ! দিলি তো সব বরবাদ করে।'

প্রজ্ঞা একটু অবাক হয়ে বলল, 'কী বরবাদ করে দিলাম আবার ?'

দুকানের লতি ছুঁয়ে গায়ক বললেন, 'একেক রাগ একেক দেব। আর একেক রাগিনী একেক দেবী। জঙ্গলের এক রাগিনীদেবী আছেন। তাঁর পায়ের কাছে হরিণ-হরিণী খেলা করে। স্পষ্ট সব দেখছিলাম। তুই আমার চোখে ধুলো ছুঁড়ে মারলি।'

'ঘাট মানছি !' প্রজ্ঞা কপট হেসে বলল। তার মনে এখন অন্য চিন্তা। ঘরে জিনিসপত্র তত বেশি কিছু ছিল না। সবগুলি ঠিকঠাক আছে কি না দেখার জন্য অস্থিরতা ছিল। সে বলল, 'কিন্তু বাজারের ভিড়ের ভেতর দিয়ে কেন ? এখন তো একশো চোখ আমাকে দেখবে।'

'লোকের চোখের দিকে তোর চোখ আছে শুনে অবাক লাগছে রে ! ভাবতাম, পণ্ডিতের বেটি কারও চোখের পরোয়া করে না।'

'তা তো করেই না। কিন্তু সে-কথা নয়। আমাদের জিনিসপত্র...'

হাত তুলে তাকে থামিয়ে মজহারউদ্দিন বললেন, 'সেখানেই তোকে নিয়ে যাচ্ছি।'

'আমি ভেবেছিলাম, আপনার ঘরে আছে।'

'আমার ঘর গানের আখড়া। আজ অবার অন্যরকম দিন। আখড়া একেবারে গুলজার। চাটুয্যের পো এস্রাজের ছড়কে তলোয়ার করে ইন্দ্রের বাবাকে ফালাফালা করছে। আবার নরসুন্দরের পোও কম যায় না। তবলার কালবোশেখির মেঘ ডাকিয়ে ছাড়ছে। কান ঝালাপালা। এদিকে একশো হুজুগে লোক এসে জুটেছে।' মজহারউদ্দিন ফোঁস করে শ্বাস ছাড়লেন। 'আমারই তল্পি গোটানোর অবস্থা। জমিদারকে কিছু করতে হবে না। পালিয়ে বেড়াচ্ছি রে!'

প্রজ্ঞা ব্যগ্রতায় বলল, 'আমাদের জিনিসপত্র কোথায় রেখেছেন?'

মজহারউদ্দিন একই ভঙ্গিতে বললেন, 'পাইক-বরকন্দাজরা ফটকের বাইরে শিরীষতলায় এনে রাখছিল। তারপর ফটক বন্ধ হলে বুঝলাম, ওদের কাজ শেষ। তখন সাগরেদদের বললাম, এক্কাগাড়ি ডেকে আন। সেই এক্কাগাড়ি করে, আবার কোথায়, সেই অগতির গতি পাটোয়ারিজি। তবে লোকটি সেয়ানা, তুইও হয়তো জানিস। হলফ করে বলতে পারি, পাটোয়ারিজি ধরেই নিয়েছে, অন্নদারানীর বাহান্নবিঘে মাটির যতখানি টিঁকে আছে, ততখানিই তার হাতের নাগালে আসবে।'

প্রজ্ঞা ফুঁসে উঠল, 'আসাচ্ছি!'

'চেপে থাক। ওটা টোপ।' মজহারউদ্দিন চাপা গলায় বললেন। 'বীরহাটায় এই একটি লোকই তোকে ঠাঁই দেওয়ার হিম্মত রাখে। দিনকতক কাটিয়ে নে ওদের বাড়িতে। পুরুত-পাণ্ডার মেয়ে। যত্নআত্যি পাবি। বিহার মুলুকে বড় হয়েছিস। খোট্টাই বুলিও আশা করি ভাল বলতে পারিস। ব্যস! আর কিছু বলার নেই।'

প্রজ্ঞা চুপ করে রইল। সে বুঝেছিল, আপাতত তার একটা আশ্রয় দরকার, যেমনই হোক।...

ছোটবেলা থেকেই ঠাঁইনড়া হওয়াটা প্রজ্ঞার কাছে কোনও নতুন ঘটনা নয়। তার বাবা কখনও টোলের পণ্ডিত, কখনও তীর্থে-তীর্থে পুরুত-পাণ্ডা হয়ে ঘুরেছেন। মোতিহারিতে একটা বাড়ি ছিল বটে, কিন্তু প্রজ্ঞার কাছে সেটা বিবর্ণ স্মৃতিফলক মাত্র। পৃথিবী তার কাছে উত্তরঙ্গ সমুদ্র। শুধুই ভেসে বেড়ানো এখান থেকে ওখানে, এক দ্বীপ থেকে আরেক দ্বীপে। কিন্তু এও আশ্চর্য, একটি নিজস্ব দ্বীপের কথা তার বাবাই মনে ঢুকিয়ে দিয়েছিলেন।

আবার এও আরেক আশ্চর্য, দ্বীপটি আবিষ্কৃত হওয়া মাত্র তার বাবা দূরে সরে

গেলেন দৃষ্টির আড়ালে। মেয়েকে পৌঁছে দিয়েই কি ভেসে গেলেন আপন স্বভাবে ?

পাটোয়ারিজি অমায়িক মুখে লক্ষ করছিলেন পণ্ডিতজির বেটিকে। ঠোঁট কামড়ে ভুরু কুঁচকে কিছু ভাবছে। প্যাঁটরা, বোঁচকা লটবহর মিলিয়ে দেখতে দেখতে সহসা স্তব্ধ। সহানুভূতি দেখিয়ে বললেন, যদি কিছু হারিয়ে গিয়ে থাকে তো সেজন্য ভাবনা বৃথা। আসল জিনিস তো তাঁরই জিম্মায় মজুত। তবে পাইকবরকন্দাজ চাকর-নোকর লোকেদের খারাপ স্বভাব থাকে। একটা বাটি কি একটা শলাইকাঠিও তাদের কাছে তুচ্ছ জিনিস নয়।

প্রজ্ঞা মাথা নেড়ে বলল, কিছু নেয়নি ওরা। সবই ঠিকঠাক আছে।

পাটোয়ারিজির বাড়িটি তাঁর গদির পেছনে। ঠাসাঠাসি চকমেলানো একতলা অনেকগুলি ঘর। বললেন, এই ঘরটা ছোট হলেও সেরা। নদীর দিক থেকে সারাক্ষণ হাওয়া আসে। গরমকালটা তিনি এ ঘরেই কাটান। পণ্ডিতের বেটিও আরামে এবং যথেষ্ট নিরাপদে যতদিন ইচ্ছে এখানে থাকতে পারে। আরও বলার কথা, একটু আগে খানসাহেবের কাছে শুনলেন, বেটি মায়ের জঙ্গলে মন্দিরের চিহ্ন খুঁজে পেয়েছে। তাই নাকি সেখানেই গিয়ে বসত করার ইচ্ছে।

প্রজ্ঞা মাথাটা একটু দোলাল।

পাটায়ারিজি হাসতে হাসতে বললেন, সেটা মন্দ হবে না। নিজের মাটিতে নিজে না বসলে দখলদারি মজবুত হয় না। তবে এত তাড়াহুড়োরই বা কী দরকার আছে ? অন্নদামাইজির মন্দিরের কথা তিনি শুনেছেন। মন্দিরটি ছিল ইটের। মায়ের বেটিও একটা ইটের মন্দির করুক। মায়ের মতো আশ্রম করুক।

প্রজ্ঞা একটু চুপ করে থেকে বলল, সেটাই তার ইচ্ছে। কিন্তু ইটের মন্দির করার ক্ষমতা তো তার নেই। ওই এলাকার লোকেরা চাইছে জঙ্গলটা আবাদ হোক। সে মুখে তাদের মাটি দেবার কথা বলেছে। কিন্তু সেটা একটা কৌশল। জমিদারবাবু তার মায়ের জঙ্গল দখল করে নেবেন শুনেছিল বলেই ওদের লোভ দেখিয়েছে মাত্র। সে চায় না জঙ্গল কাটা যাক। জঙ্গল যেমন আছে, তেমনি থাকবে।

পাটোয়ারিজি মাথা চুলকে বললেন, বেশ তো ! জঙ্গল থাক। জঙ্গলে ইটের মন্দিরই উঠুক। তা হলেই জঙ্গল আর জঙ্গল থাকবে না। সেটাই আশ্রম হয়ে উঠবে। আর দেবীর বেটি বলছে, ইটের মন্দির তৈরির ক্ষমতা তার নেই। এটা কোনও কথাই নয়। পাটোয়ারিজির যেখানে-যেখানে কারবার আছে, সেখানে-সেখানে ভক্তসাধারণের জন্য মন্দির বানিয়ে দিয়েছেন। কত ধরমশালা,

কত জলসত্রও পুরুষপরম্পরা কীর্তি তাঁদের। তবে দুর্গম জায়গায় ইট বয়ে নিয়ে যাওয়া একটা বড় অসুবিধা। কাছাকাছি কোনও নাবাল বেলেমাটির জমি খুঁজতে হবে। সেখানে ইটের ভাটা করে ইঁট বানাতে হবে। আগামী শীতকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই। ততদিন এই গরিবের ডেরায় দেবীর বেটির থাকতে আশা করি অসুবিধে হবে না।

প্রজ্ঞা আগ্রহে শুনছিল। এবার মনে হল, তার মাটির দিকে এটা হাত বাড়ানোর ফিকির কি না। তাই মুখে কৌতুক ফুটিয়ে বলল, পাটোয়ারিজি কি তার সঙ্গে তামাশা করছেন ?

পাটোয়ারিজি করযোড়ে বললেন, দেবদেবীর মন্দির নিয়ে তামাসা করা তাঁর কাছে চূড়ান্ত পাপ। এই বাংলামুলুকে তাঁদের কতপুরুষ কেটে গেল। তাঁরা ধর্মে জৈন হলেও দুর্গাকালী ভজেন। অন্নদা দেবীর ওপর কোন দেবীর ভর হয়েছিল, তাঁর সঠিক জানা নেই। তবে মাহাত্ম্যের কথা শুনেছেন, এই যথেষ্ট। একই দেবীর কত নাম থাকে, কত লীলা !

প্রজ্ঞা বলল, 'সেই দেবীর নাম অরণ্যানী।'

পাটোয়ারিজি করযোড়েই ছিলেন। কপালে ঠেকিয়ে মাথা একটু নত করে বললেন, 'তা হলে তাই।'...

॥ ৭ ॥

বাইরে কী এক শব্দ। মজহারউদ্দিন ঘর থেকে উঁকি মেরে দেখলেন ইন্দ্র ঘোড়া থেকে নামছে। গাম্ভীর্য থমথম করছে মুখে। বললেন, 'আয় বাপ দেবরাজ ! মনে হচ্ছে, স্বর্গরাজ্যে কিছু ঘটেছে। তবে আমার মুখে দাড়ি গজিয়েছে দেখে ব্রহ্মা ভাবিস নে। ফিকির বাতলাতে পারব না।'

ইন্দ্র ঘরে ঢুকে তক্তাপোসে বসল। কপালের ঘাম মুছে বলল, 'না পারলে এসব করতে গেলেন কেন ?'

'কীসব ?'

পাটোয়ারির হাতে গুঁজে দিলেন কেন পারুকে ?'

মজহারউদ্দিন হাসলেন। 'যত দোষ নন্দ ঘোষ করিস নে ! ঠাণ্ডা মাথায় ভেবে দ্যাখ, আর কী করা যেত ? তুই যদি একগুণ গোঁয়ার, পণ্ডিতের বেটি তার একশোগুণ। কিন্তু ঘটেছেটা কী, তাই বল্ শুনি।'

ইন্দ্র একটু চুপ করে থাকার পর বলল, 'অন্নদামায়ের টাঁড় জরিপ হচ্ছে দেখে এলাম। পাল্কি চেপে পাটোয়ারি গেছে। সঙ্গে আমিন। খবর পেয়ে এলাকার

লোক গিয়ে ভিড় করেছে। ভেবেছিল জমি বিলি হচ্ছে।'

মজহারউদ্দিন চোখে ঝিলিক তুলে বললেন, 'পণ্ডিতের বেটির সঙ্গে কী কথা হল তোর?'

'কোনও কথা হয়নি। আমি আড়াল থেকে দেখে চলে এলাম।'

'হুঁ! পাটোয়ারিজি কাল বলছিলেন, দেবীর মন্দির বানিয়ে দেবেন। বেশ তো! পারু যা চেয়েছে, তাই পেলে তোরই বা কী, আমারই বা কী? জঙ্গলের দেবী হয়ে জঙ্গলের পাটায় বসুক। যে তোর ঘরে যাবে না, তাকে...'

ইন্দ্র বিরক্ত হয়ে কথার ওপর বলল, 'আপনি ওই পাটোয়ারি লোকটাকে চেনেন না। ভীষণ ধূর্ত। পারু তার পাল্লায় পড়েছে, কী হয় দেখবেন। আপনাকে আমি জ্ঞানী মানুষ ভাবতাম।'

'তুই হয়তো ঠিকই ধরেছিস। আমি মূর্খ রে, বড়ই মূর্খ! কিন্তু পণ্ডিতের বেটির হাড়ে হাড়ে বুদ্ধি। তুই ওকে চিন্তে পারিসনি।'

ইন্দ্র ফুঁসে উঠল একথা শুনে। বলল, 'আপনি জানেন এলাকার যেসব লোককে জমি দেবার লোভ দেখিয়েছিল, তারা পাটোয়ারিকে ওখানে দেখে পারুর ওপর চটে গেছে?'

'তোকে কে বলল সে-কথা?'

'ফেরার পথে কুলখাড়ির একটা লোকের সঙ্গে দেখা। ভাদু শেখ তার নাম।' ইন্দ্র এবার ক্লান্তভাবে বলতে থাকল। 'ভাদু শেখকে আপনি চেনেন না। এলাকার এক দুর্ধর্ষ মানুষ। রাগ করে নদীর ধারে এসে বসেছিল। আমাকে দেখে বলল, অন্নদারানীর টাঁড়ে পাটোয়ারিকে দেখে তার মাথায় আগুন ধরে গেছে। পাটোয়ারি দাদনদার মহাজন। সে যদি পারুর মুরুব্বি হয়, তা হলে তাদের বন কেটে আবাদের স্বপ্ন বৃথা। যে বেশি সেলামি দেবে, সে-ই মাটি পাবে। তারা ভেবেছিল অন্য কিছু। মন্দির তৈরি হয় হোক। কিন্তু জঙ্গল জঙ্গলই থাকবে, এটা একটা ধোঁকাবাজি। স্রেফ পাটোয়ারির খেলা। ভাদু শেখ বলল, সেলামির দর বাড়ানোর ধান্দা। এ তারা সহ্য করবে না।'

'তুই কী বললি?'

'আমার বলার কিছু ছিল না।'

মজহারউদ্দিন সদ্য গজানো দাড়িতে হাত বুলিয়ে বললেন, 'ছিল। তুই বললে পারতিস, জঙ্গল কেটে মাটিকে আবাদি জমি করতে ভাদু শেখ গোরে যাবে। গাছপালা না হয় কাটা যায়। কিন্তু তাদের শেকড়বাকড় ওপড়ানো সহজ কথা নয়। না ওপড়ালে লাঙল চলবে কী করে? জঙ্গল কেটে বসত করা সোজা।

ফসল ফলাতে দু-তিনপুরুষ সময় লাগে। শেকড়বাকড় সাংঘাতিক আপদ। এতো উলুখড় কি ঝোপঝাড় নয়, গাছের জঙ্গল।'

ইন্দ্র একটু হাসল। 'তা ঠিক। কিন্তু বললেও ওরা বুঝতে চাইবে না। আমি ওদের ছেলেবেলা থেকে জানি। মাটি অবাদি হওয়ার অপেক্ষায় দু-তিনপরুষ কেন, পাঁচ-সাত পুরুষ পর্যন্ত কাটাতে রাজি। মাটি ওদের স্বপ্ন। মাটি ছাড়া আর কিছু বোঝে না।'

'ভাবিস নে। পণ্ডিতের বেটির জিম্মাদার জুটিয়ে দিয়েছি। পাটোয়ারিজির হাতে আজব সব কলকাঠি আছে। জাদুকর রে!' মজহারউদ্দিনের চোখে ঝিলিক খেলল আবার। 'এবার তোর কথাটা বল্?

আমার কী কথা?'

'পণ্ডিতের বেটি বুঝি আর পাত্তা দিচ্ছে না তোকে?'

ইন্দ্র রাগতে গিয়ে হেসে ফেলল। 'কে কাকে পাত্তা দেয়! আমার মন এখন বাঘটার দিকে। গয়লাদের বাথানে যখন-তখন হামলা করছে। গুলির শব্দেও আর ভয় পায় না। গতরাতে একটা বাছুর নিয়ে গেছে। ঠিক করেছি, বাঘটাকে মারব।'

'দেবীর বাহন। সাবধান!'

'আমি ওসব মানি না, চাচা!'

ইন্দ্র কথাটা বলেই উঠল। মজহারউদ্দিন চুপ করে রইলেন। ইন্দ্র ঘর থেকে বেরিয়ে বারান্দায় হঠাৎ দাঁড়িয়ে পিছু ফিরল। কিছু বলতে ঠোঁট ফাঁক করেছিল সে। কিন্তু বলল না। চলে গেল।

মজহারউদ্দিন তাকিয়ায় ঠেস দিয়ে চোখ বুজে রইলেন। পণ্ডিতের মেয়ে পাটোয়ারির আশ্রয়ে আছে খবর পেয়ে চন্দ্রনাথ চৌধুরি তাঁর অস্টিন গাড়িতে সদরে ফেরত গেছেন। পাটোয়ারিজি বীরহাটায় এক দুর্ভেদ্য দুর্গ। দেওয়ান চিন্তামণি নাকি পেশকার হাসিম মিরের পরামর্শে কোন উকিলবাবুর কাছে 'মিসপাসেনিফিকেশন'-মামলার আর্জির খসড়া করে এনেছিলেন। চন্দ্রকান্ত তা ছিঁড়ে ফেলেছিলেন। যশোদা গোসাঁইয়ের কাছে শোনা কথা। গোসাঁই অবশ্য সবকিছুতে রঙ চড়াতে পটু। তাঁর জানার কথা নয়, মজহারউদ্দিনের কাছে কী ব্রহ্মাস্ত্র আছে। মকসুদা বেগমের নিলামি সম্পত্তির জালিয়াতি চন্দ্রনাথ চৌধুরিকে ঘানি টানিয়ে ছাড়ত। আসলে চন্দ্রনাথ সেই আভাস পেয়েই আর্জির খসড়া ছিঁড়েছেন, মজহারউদ্দিন ছাড়া আর কেই বা জানবেন?

কিন্তু সুদূর লখনউতে এক বৃদ্ধা দিন গুণছেন, কবে তাঁর পৌত্র সেতাপগঞ্জ

মহাল উদ্ধার করে দেবে ! তাঁর মাটি উদ্ধার করতে এসে সে যে অন্যের মাটির উদ্ধারকর্তা হয়ে বসবে, এর নামই কি দৈব ? চোখ বুজে মজহারউদ্দিন দেখছিলেন ধাবমান ঘোড়ার পিঠে এক যুবক আর এক যুবতীকে। রাগ ও রাগিনীর মিলন। এই মিলনেই সৃষ্টি-স্থিতি-লয়। ওস্ততাদজি বলতেন। দুই কানের লতি ছুঁলেন গায়ক। সমগ্র চেতনায় ক্রমে সুর ঝংকার।

বিকেলে নদীর বাঁধে অভ্যাসমতো বেড়াতে বেরিয়েছেন, আবার ইন্দ্রের সঙ্গে দেখা হল। বললেন, 'বাঘটা না মেরে ছাড়বিনে তা হলে ! ভাল কথা। মারতে পারিস তো বুঝব, দেবীর বাহন নয়। নেহাত গরুছাগলখেকো জীব।'

ইন্দ্র ঘোড়া থেকে নেমে বলল, 'পারু আমাকে বলেছিল বাঘটা দেবীর বাহন। আপনিও বলেছেন। দেখা যাক।'

মজহারউদ্দিনের মুখে কৌতুক ঝলমল করছিল। 'হ্যাঁ রে, পারু তোকে বাঘ মারতে নিষেধ করেনি ?'

'করেছিল। কিন্তু নাখুরামদের যে বাছুরটা মারা পড়ল, তার দাম কি পারু দেবে ? বলুন না ওকে পাটোয়ারির কাছে জঙ্গল বাঁধা দিয়ে দাম শোধ করুক।'

'মেয়েটার ওপর তোর দেখছি বেজায় রাগ হয়েছে।'

'এটা রাগের কথা নয়। পারুর কাছে তার মায়ের জঙ্গলের যা দাম, নাখুরামদের কাছে তাদের গোরুমোষেরও তাই। কোন মুলুক থেকে বেচারারা এতদূরে এসে বিলেজঙ্গলে পড়ে আছে। পারুকে বোঝান।'

'তুই বোঝাবি। আমার আর কী দায় ?'

ইন্দ্র গলার ভেতর বলল, 'ও এমন স্বার্থপর মেয়ে, কল্পনাও করিনি।'

'কেন এ কথা তোর মনে হচ্ছে ?'

'আপনি গুরুজনের তুল্য। সব কথা খুলে বলতে বাধে।'

ইশারায় বললে বুঝব।'

ইন্দ্র দূরে তাকিয়ে বলল, 'যেদিন থেকে পাটোয়ারির হাতে ওকে তুলে দিলেন, সেদিন থেকেই ও আমার সঙ্গে সম্পর্ক বন্ধ করল। কথা ছিল, পরদিন ওর মায়ের জঙ্গলে দেখা হবে। দিনটা আমরা বাথানে কাটাব। তারপর সন্ধ্যায় আবার জঙ্গলে যাব, সত্যিই ওই জঙ্গলে সুগন্ধ ছাড়ায় নাকি...'

মজহারউদ্দিন বললেন, 'সুগন্ধ ! কিসের সুগন্ধ ?' কণ্ঠস্বরে ছটফটানি ছিল।

'আপনি শোনেননি কিছু ? পারু বলেনি আপনাকে ?'

'না তো।' মজহারউদ্দিনের কণ্ঠস্বরে তীব্রতা আরও ব্যক্ত হল। 'কিসের সুগন্ধ, ইন্দ্র ?'

'ওই এলাকার লোকের কাছে শুনেছিলাম সন্ধ্যার দিকে নাকি অন্নদামায়ের টাঁড়ে আশ্চর্য একটা গন্ধ ছড়ায়। পারুও শুনেছিল। মুসলমানরা বলে আতরের গন্ধ। আর হিন্দুরা বলে চাঁপাফুলের গন্ধ।'

মজহারউদ্দিন একটু হাসলেন। 'দেবী অরণ্যানীর ব্যাপার-স্যাপার। তো পারু যায়নি কথামতো?'

'না। তারপর তার আর পাত্তাই নেই। আমি কি ওর জন্য পাটোয়ারির বাড়ি যাব ভেবেছিল? হঠাৎ আজ সকালে বাথান থেকে ফেরার সময় দেখি, পাটোয়ারি আর লোকজনের ভিড়। জঙ্গল জরিপ হচ্ছে। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার, পারু ঘুরে তাকালেই আমাকে দেখতে পেত। তাকাল না।'

মজহারউদ্দিন আপন মনে বললেন, 'সন্ধ্যায় জঙ্গলে সুবাস ওঠে! আতর কি চাঁপার গন্ধ! ভাববার কথা বটে।'

ইন্দ্র ঘোড়ার পাদানিতে পা রেখে বলল, 'আমি এসব বুজরুকিতে বিশ্বাস করি না। এখন বসন্তকালে জঙ্গলে কতরকম ফুল ফোটে। সন্ধ্যায় হয়তো কোনও ফুল ফোটার গন্ধ ছড়ায়। আমি পারুর ভুলটা ভাঙিয়ে দিতে চেয়েছিলাম।'

'ভুলই যার সুখ, তার ভুল ভাঙাতে নেই রে!'

ইন্দ্র ঘোড়ার পিঠে চেপে ঢালু পাড় বেয়ে নদীগর্ভে নামল। তারপর বালির চড়ায় পৌঁছে ঘোড়া ছোটাল। মজহারউদ্দিন তাকিয়ে রইলেন। দূরে বাঁকের মুখে ঘোড়সওয়ার অদৃশ্য হলে গুনগুন করে সুর ভাঁজতে থাকলেন। সুরে আনন্দের বিহ্বলতা। দিনশেষে দেবী অরণ্যানীর সুবাসটিকে রূপ দেবার চেষ্টা করছিলেন। কোনও-কোনও মুহূর্তে গন্ধ ধ্বনিরূপে আর ধ্বনি গন্ধরূপ কি ছড়িয়ে যায় না?

'ওস্তাদজি' ডাকে তানছুট হওয়ায় গায়ক খাপ্পা। পেছন ফিরে তাকিয়ে গুনুকে দেখতে পেলেন। সুবাসটিও দূরে সরে গেল মুহূর্তে। রাগী চোখে দৃষ্টিপাত করলেন।

গুনু বলল, 'দুর থেকে দর্শন করি আর বড়ই একলা লাগে ওস্তাদজিকে। আমি এক গোমুখ্যু। জ্ঞানীকে সঙ্গ দিই, সে বিদ্যাও নেই। সাহসও নেই। পণ্ডিতমশাই যা পারতেন, আমি কি তা পারি? বড় জোর পেছন-পেছন ধরে কেটে মেরেকেটে করে ঠেকা চালিয়ে যাওয়া।'

তবলা হয়ে যাচ্ছিস দিনেদিনে। তবলা হাতের যন্তর, মুখের নয়।'

গুনু কাঁচুমাচু মুখে বলল, 'সুরকে তালকানা হতে দেওয়া ঠিক না। তালে চললে সুরের তবেই সোয়াস্তি। ওই যেমন ঘোড়ায় চেপে ছোটবাবু গেলেন।

ইদানিং আপনাকে কেমন যেন তালকানা ঠেকছে।'

গায়ক ঘাসের ওপর বসে বললেন, 'নরসুন্দরের পো তুই। কথায় এঁটে ওঠা কঠিন। আয়, বস এখানে।'

গুনু সমীহ করে একটু তফাতে বসল। তারপর ফিক করে হাসল। 'ছোটবাবুকে অবেলায় কোথায় পাঠালেন?'

'আমি পাঠাবার কে? নিজেই গেল। বাঘটাকে না মেরে বোধ করি বাড়ি ফিরবে না।'

'খানকির টাঁড়ে...' বলেই জিভ কাটল গুনু। 'ছোটবেলা থেকে অভ্যেস। দোষ নেবেন না। অন্নদামায়ের টাঁড়ে শুনলাম পাটোয়ারিজির হাত পড়েছে। সেখানে গিয়ে আর সুবিধে করতে পারবেন না ছোটবাবু। দেখবেন, যে বাঘকে গুলি করার জন্যে হন্যে হচ্ছেন, পাটোয়ারিজি তাকে আদর করে চিনি খাওয়াচ্ছেন। গুলি করলে পাটোয়ারিজির গায়ে লাগবে।'

'তবলা থামা।' মজহারউদ্দিন ধমক দিলেন।

'তবলার যে থামতে ইচ্ছে করছে না। তা ছাড়া এই তো সবে তানের শুরু।'

'হুঁ, কথাটা হয়তো ঠিকই বলেছিস। সবে শুরু।' একটু চুপ করে থাকার পর মজহারউদ্দিন ফের বললেন, 'হ্যাঁ রে! অন্নদারানীর টাঁড়ে নাকি সন্ধ্যাবেলায় কী গন্ধ ছোটে, শুনেছিস কথাটা?'

গুনু হাসতে হাসতে বলল, 'অন্নদামা নাকি সন্ধ্যাবেলায় চাঁপাফুলের মালা পরত। নিজে ভেসে যায় বটে, কিন্তু ওই গন্ধটা রেখে যায় নিজের পাটায়। শোনা কথা।'

'মুসলমানরা নাকি বলে আতরের গন্ধ?'

'সেও শুনেছি। সংসারে যে যার নিজের মতো করে ভাবে আর কী!'

'তুই কখনও গেছিস সেখানে?'

'নাঃ। আমি নরসুন্দরের পো! মানুষ কামাই। গাছপালা কামাতে যাব কোন দুঃখে? তবে পাটোয়ারিজির কথা আলাদা। তিনি নরসুন্দরের বাড়া। জঙ্গল কামানোর ধান্দা পেলে ছাড়েন না। জঙ্গল কামালে মাটি বেরুবে। আর এ কি বীরহাটার মতো শক্ত আফলা মাটি? তার সঙ্গে গাছপালার দাম হিসেব করুন।'

'পণ্ডিতের বেটি জঙ্গল কাটতে দেবে না রে! সে জঙ্গলের দেবী হয়ে জঙ্গলে থাকবে।'

'হ্যাঁ, মায়ের মতো শোভা খুলবে। তবে...'

'থামলি যে?'

গুনু আস্তে বলল, 'মাকে নদী খেয়েছিল। মেয়েকে পাটোয়ারিজির চিনিখাওয়া বাঘে না খায়!'

'ভাবিয়ে তুললি দেখছি।' মজহারউদ্দিন একটু গম্ভীর হলেন। 'তবে বাঘটা যদি দেবীর বাহন হয়?'

'দেবীর পায়ের তলার প্রসাদ সেও চেটে খাবে বৈকি।'

'কিছুক্ষণ আগে ইন্দ্র বলে গেল, কাজটা ঠিক করিনি। এখন তোর কথাতেও সেই আভাস। কিন্তু মেয়েটার তো একটা ডেরা দরকার। জঙ্গলে গিয়ে থাকবে বললেই তো হুট করে রওনা হওয়া যায় না। খড়বাঁশের হোক, যা কিছুর হোক, একটা ডেরা গড়তে সময় লাগে। অগত্যা পাটোয়ারিজির বাড়িতে থাকার যোগাড় করে দিয়েছিলাম। কিন্তু কেমন মেয়ে, আমার সঙ্গে শলাপরামর্শ না করেই...' হঠাৎ থেমে মজহারউদ্দিন একটু হাসলেন। 'নাঃ! বেটি বড় চালাক। যত চালাক, তত সাহসী। মায়ের চেয়ে এককাঠি সরেস রে!'

'এমন করে বলছেন যেন মেয়ের মাকেও দেখেছেন!'

মজহারউদ্দিন তার দিকে তাকালেন। একটু পরে বললেন, 'তোর কী মনে হয়?'

গুনু একটা ঘাস ছিঁড়ে আঙুলে জড়াতে জড়াতে বলল, 'ঘোলা জলের তলায় কী আছে দেখা যায় না। তবে জল যদি নড়ে, বোঝা যায় একটা মাছ ঘাই মারছে। মনে হচ্ছে, মাছ ঘাই মারল।'

মজহারউদ্দিন ঠোঁটের কোণে হাসলেন। 'এইজন্যই কথায় বলে নাপিত ধূর্ত। তবে মাছ ঘাই মারল, নাকি নিজেই ঢিল ছুড়লি? আন্দাজে ঢিল। দেখি, লাগে কি না। এই তো?'

'বলতে পারেন।' গুনু হাসতে লাগল। 'কিন্তু তা-ই যদি হয়, বলব ঢিলটা লেগেছে।'

গায়ক সূর্যাস্ত দেখায় মন দিলেন। তারপর গুনগুন করে সুর ভাঁজতে থাকলেন। সূর্য দিগন্তরেখার নীচে অদৃশ্য হলে সুর থামিয়ে বললেন, 'একটু বস বাপ! নদীর চড়ায় মাথা কুটে আসি।'

'ওস্তাদজি যদি কিছু মনে না করেন, একটা কথা বলি।'

'বল্।'

'আপনি বলতেন গানেই আপনার নামাজ পড়া।'

'হুঁ। কিন্তু কী জানিস? কখনও-কখনও হাড়-মাংস-রক্তে গড়া এই

হারামজাদা দেহটাকেও কারও পায়ে নুইয়ে দিতে ইচ্ছে করে। গান আমার নামাজপড়া বটে, তবে সে মনের নামাজ।' মজহারউদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন। ধুতির কাছা খুলে কোঁচা করে সামনে গুঁজলেন। 'বলবি,, কাছা খুললাম কেন। যে-লাইনের যা রীতি, ঠিকঠিক মানতে হয়। নৈলে খুঁত থেকে যায়। পণ্ডিত কানে পৈতে জড়িয়ে হিসি করতে বসত। একদিন বললাম, হিসির সঙ্গে কানের সম্পর্ক কী হে ? পণ্ডিত বলেছিল কী জানিস ? কানে না তুললে হিসির ছিটে লেগে পৈতে অপবিত্র হবে। শালা আমাশারুগির মতো মুখ করে থাকত বটে, ভেতর-ভেতর রসের নদী !'

মজহারউদ্দিন ঢালু পাড় বেয়ে নামতে থাকলেন। গুনু বলল, 'নামাজের আগে শালা-টালা করে মুখখানা নষ্ট করলেন !'

'ওরে বুদ্ধু ! ওজু করলেই দেহ শুদ্ধ। বসে-বসে দ্যাখ না কী করি।'

গুনু গায়কের ছড়িয়ে রেখে যাওয়া সুরটা কুড়িয়ে নিল। তবলচির স্বভাব, সে বাঁ হাত মুঠো করে ডান হাতের আঙুলে ঠেকা বাজাতে থাকল। মজহারউদ্দিন ততক্ষণে তিরতিরে একফালি জলস্রোতের কাছে গিয়ে বসেছেন। প্রার্থনার জন্য প্রক্ষালনে পাঞ্জাবির হাতা গুটোনো এবং মাথায় গোল টুপি। শাদা কাপড়ের রঙ দিনশেষের আলোয় উজ্জ্বলতর।

দূরে আবছা হুমহুম কী শব্দ শুনে গুনু ঘুরল। নদীর ভাটির দিক থেকে বাঁধের পথে একটা পাল্কি আসছে। পেছনে একদঙ্গল লোক ধুকুরধুকুর দৌড়ুচ্ছে। কাহারদের হুমহুম শব্দটা বাড়ছে।

কাছাকাছি এলে গুনু বাঁধের ঢালে নামল। পাল্কির ভেতর পাটোয়ারিজি। পেছনে তাঁর পাইকবাহিনী, হাতে লাঠি আর বল্লম। পাল্কি-বাহিনী চলে গেলে গুনু আবার বাঁধের মাথায় গিয়ে বসল।

মজহারউদ্দিন নামাজ সেরে এসে বললেন, 'পাল্কিতে পণ্ডিতের বেটিকে দেখলি নাকি রে ?'

গুনু বলল, 'না তো ! পাটোয়ারিজি একা।'

মজহারউদ্দিন ভাটির দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বেটি পায়ে হেঁটে আসছে। সঙ্গে ওটা কে, দ্যাখ তো চিনতে পারিস নাকি।'

দেখে নিয়ে গুনু বলল, 'আমিনবাবু মনে হচ্ছে। আমাদের চাটুয্যেমশাইয়ের কে যেন হয়। জরিপে পাস দিয়েছে। এও এক বড় বিদ্যা ওস্তাদজি !'

'জরিপ ?' বলে মজহারউদ্দিন ঘাসে বসলেন।

'আজ্ঞে।' গুনু বাঁকা হাসল। 'নয়কে ছয়, ছয়কে নয় করার বিদ্যা।

পণ্ডিতমশাইয়ের মেয়েকে আড়ালে কথাটা বলে দেওয়া ভালো। নৈলে মায়ের নকড়া ছকড়ায় গিয়ে ঠেকাবে।'

মজহারউদ্দিন দেখলেন, আমিনবাবুকে ছেড়ে প্রজ্ঞা নদীর ঢালু পাড় বেয়ে দৌড়ে চড়ায় নামল। আমিনবাবু দাঁড়িয়ে কিছু বললেন। প্রজ্ঞা স্রোতের কিনারায় পা ডুবিয়ে এগিয়ে আসছে, ভঙ্গিটি বালিকার। গ্রাহ্য করল না সঙ্গীকে। তখন তিনি যেন বিরক্ত হয়েই নিজের রাস্তা ধরলেন।

গায়ক এবং তবলচির পেছন দিয়ে বীরহাটার দিকে এগিয়ে গেলেন আমিনবাবুটি। গুনু হাসি চেপে বলল, 'রাগিয়ে দিল কি না কে জানে! যেভাবে হেঁটে গেল, আমরা মানুষ না গাছ। কিছু বুঝলেন? ও ওস্তাদজি! বলুন। আপনি তো মানুষচরানো রাখাল!'

মজহারউদ্দিন কপট গাম্ভীর্যে বললেন, 'রাখাল বললি যখন, তখন বলি, চাটুয্যেদের এই বাবুটি আস্ত দামড়া।'

গুনু হাসতে গিয়ে থামল। নীচে প্রজ্ঞা। মজহারউদ্দিনের চোখে চোখ পড়লে বললেন, 'কী রে? মেপেজুপে হাতে কত পেলি? আয়, বল্। শুনবার জন্য পথ তাকিয়ে বসে আছি।'

প্রজ্ঞা শান্তভাবে উঠে এল। আঁচলে ভিজে মুখ মুছতে মুছতে একটু তফাতে বসল। তারপর ছোট্ট একটা শ্বাস ফেলে বলল, 'ভেবেছিলাম, আপনিও রেগে মুখ ভার করে থাকবেন।'

'আমি তোর কে যে রেগে মুখ ভার করব?'

'আঃ! অমন করে কথা বললে কানে লাগে।'

মজহারউদ্দিন একটু হাসলেন। 'যাক গে! পাটোয়ারিজিকেও মায়ের পাটা দেখিয়ে ছাড়লি। ভাল কথা। এবার জরিপের খবর বল্, শুনি।'

প্রজ্ঞা আস্তে বলল, 'ইন্দ্র বলেছিল চল্লিশ-বেয়াল্লিশ বিঘে। কুলখাড়ি-শেতলদ'র লোকেদের হিসেবে সাতচল্লিশ। আমিনবাবু মেপে বলল, ছত্রিশ। সেই নিয়ে কথা হচ্ছিল। আসার পথে বলে কী, দুরকম মাপ আছে। যে মাপে মেপেছে, তাতে ছত্রিশ বিঘে। অন্য মাপে নাকি দাঁড়াবে পঞ্চাশ বিঘে। মন্দিরের দিকে মোটে বিঘে দুই নাকি নদীর পেটে গেছে। বুঝুন তা হলে!'

গুনু বলল, 'দিদি! আমার হাতে বড় আমিনবাবু আছে। সেটেলমেন্টে চাকরি করা আমিন। খুব পাকা লোক।'

'আমি আর মাপজোকে নেই। যা আছে, আছে।'

মজহারউদ্দিন বললেন, 'তা হলে এমন হইহল্লা করে মাপতে গেলি যে?'

প্রজ্ঞা বলল, 'পাটোয়ারিজি বললেন, আশেপাশে জমিদারের মাটি আছে। সীমানা মেপে চিহ্ন করে রাখা উচিত। নৈলে কবে হয়তো আমার মাটিতেই লোক বসিয়ে দেবেন। না—ইন্দ্রের বাবা যদি তাঁর মাথা নাও ঘামান, দেওয়ানবাবুকে তো বিশ্বাস নেই। তার হাতেই সব।'

'ইন্দ্র ওদিকেই বাঘ মারতে গেছে। দেখা হয়নি?'

প্রজ্ঞা মাথা দোলাল। মুখে কিছু বলল না।

মজহারউদ্দিন সকৌতুকে বললেন, 'দেবীর বাহন মারে সাধ্য কার, তাই না?'

প্রজ্ঞা মুখ নামিয়ে ঘাস ছিঁড়তে থাকল। একটু পরে বলল, 'আপনার কাছে যাব বলেই পাটোয়ারিজির পাল্কিতে চাপিনি। কথা আছে।'

অবস্থা আঁচ করে গুনু উঠে দাঁড়াল। 'চাবি দিন ওস্তাদজি! গিয়ে আখড়ায় ধুনো জ্বালি। এতক্ষণ চাটুয্যেমশাই এসে উঠোনের পাথরটাকে আসন করেছেন। বোধ করি, প্যাঁ পোঁ-ও চলছে।'

আখড়ার চাবি নিয়ে গুনু চলে যাওয়ার পর প্রজ্ঞা বলল, 'আপনার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। আমি মেয়ে। পুরুষমানুষ হলে···'

বাধা দিয়ে মজহারউদ্দিন বললেন, 'কথাটা কী তোর?'

প্রজ্ঞা মৃদু স্বরে বলল, 'পরের বাড়িতে থেকেই জীবন কেটেছে। কতবার বাবা যজমানবাড়িতে আমাকে রেখে দু তিন মাসের জন্য বাইরে গেছেন। কিন্তু এবারকারটা একেবারে অন্যরকম।'

'কীরকম? যত্নআত্যি হচ্ছে না?'

'হচ্ছে। কিন্তু···' একটু চুপ করে থাকার পর প্রজ্ঞা মুখ নামিয়ে বলল, 'পাটোয়ারিজির বাড়ির লোকেরা আমাকে মনেমনে ঘৃণা করে। ওদের মেয়েরা আমার ছায়া মাড়ায় না। আমি জানি, ওরা আমাকে কী ভাবে। আমার অসহ্য লাগছে, চাচা!'

'হু। বুঝতে পারছি।' মজহারউদ্দিন চিন্তিতমুখে বললেন।' কিন্তু আর কোথায় বা তোর আশ্রয় জুটত? তোর সামনে দুটো রাস্তা খোলা ছিল'। একটার কথা আর তুলতে চাইনে। দ্বিতীয়টা ছিল মায়ের পাটায় গিয়ে বসা। কিন্তু সেও তো আর নিরাপদ মনে হচ্ছে না। খবর পেলাম, এলাকার লোকেরা মাটি পাবে না জেনে চটে গেছে। দুর্ধর্ষ প্রকৃতির মানুষজন ওরা। একটুতেই খুন খারাপি করে ফেলে।'

প্রজ্ঞা জোর দিয়ে বলল, 'না। আমার কোনও ক্ষতি ওরা করবে না।'

মজহারউদ্দিন চোখে হেসে বললেন, 'করতে এলেও বন্দুকবাজ পাহারাদার

তা ঠেকাবে। না কি ?'

প্রজ্ঞা অনিচ্ছাসত্ত্বেও হাসল। 'ইন্দ্র দূর থেকে আমাকে দেখেই কেটে পড়ল। দেখেও দেখল না।'

'তুইও নাকি ওকে দেখেও দেখিসনি ?'

'ইন্দ্র বলেছে ?'

'হ্যাঁ। জঙ্গল জরিপের সময় ও তোর কাছাকাছি গিয়েছিল।'

'কিন্তু বিশ্বাস করুন, আমি সত্যিই ওকে দেখিনি। জরিপের দিকে মন ছিল।'

'তা হলে নিছক ভুল বোঝাবুঝি। আবার সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে।'

প্রজ্ঞা শ্বাস ফেলে বলল, 'জঙ্গলে গিয়ে যে ঘর বাঁধব, এলাকার লোকেদের বললে অন্তত খড়বাঁশের একটা ঘর গড়ে দিত। এখন আর তা দেবে না। ক্ষতি হয়তো করবে না, কারণ ওরা আমাকে দেবীর মেয়ে বলে জানে। কিন্তু আজ যা মনে হল, আপনি ঠিকই বলেছেন, ওরা আমার ওপর চটে গেছে। দূরে দাঁড়িয়ে ভিড় করে দেখছিল। তারপর একে একে কেটে পড়ল সবাই। দুপুরে পাটোয়ারিজির সঙ্গে খাওয়া সেরে নদীতে পাত্রগুলো ধুতে গেছি, শশর মেয়ে আলোর সঙ্গে দেখা। বলল, পাটোয়ারিবাবুকে জঙ্গল বেচে দিচ্ছি কেন ? পাটোয়ারিবাবু জঙ্গলে এলে নাকি জঙ্গল পুড়ে ছাই হয়ে যাবে। ওকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম। বুঝল না। চলে গেল।'

'পাটোয়ারিজিকে বলেছিস এসব কথা ?'

'বলেছি। উনি বললেন, আগামী বছর মন্দির উঠবে। জঙ্গল আশ্রম হয়ে যাবে আগের মতো। তখন হিন্দুরা আসবে মাথা নোয়াতে। মুসলমানরা জানবে, হিন্দুর ধর্মস্থান। কাজেই ও নিয়ে চিন্তা করার কিছু নেই।'

'পাটোয়ারি বুদ্ধি !'

'কিন্তু আমার আর ও বাড়িতে থাকা অসহ্য হয়ে উঠছে। ভাবছি, মায়ের কাছে গিয়েই থাকব। অথচ সমস্যা হল। খড়-বাঁশের ঘর গড়তে টাকাকড়ি চাই। কিচ্ছু নেই।'

'নেই বলে যেন পাটোয়ারিজির কাছে হাত পাততে যাস নে। বিনি তমসুকে এক পয়সাও পাবিনে। আর তমসুকে সই দিলেই সর্বনাশ হবে।'

'জানি।' প্রজ্ঞা আস্তে বলল, 'আজ এও জেনে গেছি যে, মন্দির একটা পাল্টা টোপ। আপনি বলেছিলেন, আমার মাটিটা পাটোয়ারিজির সামনে একটা টোপ। পাটোয়ারিজি উল্টে আমার সামনে টোপ ঝুলিয়ে দিয়েছেন।'

'হুঁ, তোর বুদ্ধি আছে। ঠিকই বুঝেছিস।' মজহারউদ্দিন উঠে দাঁড়ালেন।

'আয় ! তোকে পৌঁছে দিই।'

চলতে চলতে প্রজ্ঞা বলল, 'আমার কথাটা আমল দিলেন না ?'

'দিয়েছি। আর কয়েকটা দিন কষ্ট করে থাক। জঙ্গলের পাটায় বসার ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।'

প্রজ্ঞা ধরা গলায় বলল, 'জানি না, পূর্বজন্মে আপনার সঙ্গে কোনও সম্পর্ক ছিল কি না। কিন্তু বিশ্বাস করতে ইচ্ছে হয়, নিশ্চয় ছিল। না থেকে পারে না।'

'কেন রে ? এ জন্মেই থাকা কি অসম্ভব কিছু , তোর মা···' হঠাৎ থেমে গেলেন মজহারউদ্দিন।

প্রজ্ঞা থমকে দাঁড়াল। তার দুচোখে বিস্ময় ছিল। ব্যগ্রতায় বলল, 'কী ? বলুন !'

মজহারউদ্দিন শুকনো হাসলেন। 'পুরনো কথা রে ! যা চাপা আছে, চাপা থাক।'

'আপনি না বললে আমি এখানেই গঁড়িয়ে থাকব।'

'বেটি ! মুখ ফসকে কথাটা বেরিয়ে গেছে। নাকি ওস্তাদজির ইচ্ছা !' দুকানের লতি ছুঁলেন মজহারউদ্দিন। 'ঠিক আছে। জঙ্গলের পাটায় তোকে বসাই। তারপর সব শুনবি।'

প্রজ্ঞা ভাঙা গলায় বলল, 'না। আমি এখনই শুনতে চাই।'

'বড় জেদি রে তুই ! শুধু এটুকু বলছি, তোর বাবার যেমন আসল একটা নাম ছিল, তোর মায়েরও তাই।'

'কী নাম ?'

'হীরা বাঈ।'

প্রজ্ঞা প্রায় চিৎকার করে উঠল, 'না ! মিথ্যা, মিথ্যা, মিথ্যা !' তারপর হনহন করে হাঁটতে থাকল। পালিয়ে যাওয়ার মতো।

মজহারউদ্দিন ডাকলেন, 'পারু ! কথা শোন বেটি !'

প্রজ্ঞা পিছু ফিরল না। মজহারউদ্দিন চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলেন। আঁধার ঘনিয়ে এসেছিল। তারপর নদী পেরিয়ে একটা জোরালো হাওয়া এসে অতীতের সমস্ত স্মৃতি নিয়ে তাঁর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল।···

নাথুরামদের বাথানে ঘোড়াটিকে বেঁধে রেখে ইন্দ্র অন্নদারানীর টাঁড়ের দিকে আসছিল। তার মনে অসহ্য জ্বালা। গাছপালার ফাঁকে দেখা সেই দৃশ্যটি বারবার মনে ভেসে আসে। প্রজ্ঞার পাশে দ্বিতীয় কোনও পুরুষকে দেখা তার

পক্ষে অসহনীয় ঘটনা। আমিনবাবু হোক কি যেই হোক, প্রজ্ঞা একলা হয়ে তার পাশে কেন ? পাটোয়ারিজির সঙ্গে এসেছিল। তাঁর সঙ্গেই ফিরে না গিয়ে ওই লোকটার সঙ্গে জঙ্গলের পথে প্রজ্ঞার এটা কেমন যাওয়া ? হঠাৎ ইন্দ্রকে দেখতে পেয়ে প্রজ্ঞার থমকে দাঁড়ানো এবং মুখে খানিকটা রোদ পড়ায় একটু চমকও যেন ছিল, ইন্দ্র দৃশ্যটি যতবার স্মৃতির মধ্যে দেখছিল, ততবারই মাথায় খুন চড়ে যাচ্ছিল। মজহারউদ্দিন বলেছিলেন, মেয়ের আত্মায় মায়ের খেলোয়াড়ি। সবই তা হলে প্রজ্ঞার খেলা। তাকে খেলার ঘুঁটি করেছে প্রজ্ঞা। মায়ের দলিল হাতানো থেকে শুরু করে যা কিছু এতদিন ঘটেছে, সমস্তটার মানে বদলে যাচ্ছিল ইন্দ্রের কাছে। ভালবাসার ভান করে নিজের আখের গোছানোর ফিকির। আবাদি জমি দেওয়ার ছল করে যেমন এই এলাকার মানুষগুলিকে ঠকিয়েছে, ইন্দ্রকেও তেমনি ঠকিয়ে এসেছে। এবার পাটোয়ারির দুর্গে ঢুকে স্বরূপ দেখাচ্ছে প্রজ্ঞা !

মজহারউদ্দিন বলেছিলেন, ইন্দ্র যদি স্ত্রীর মর্যাদা দিয়ে প্রজ্ঞাকে ঘরে তুলতে চায়, প্রজ্ঞা কি পারবে যেতে ? ইন্দ্রও অকপটে ডেকেছিল প্রজ্ঞাকে। প্রজ্ঞা বলেছিল, এখনও তার সময় হয়নি। খেলা ! সত্যিই প্রজ্ঞা তার মায়ের মতো খেলোয়াড় মেয়ে। কিন্তু ইন্দ্র তার খেলা ভেঙে দিতে এবার তৈরি।

পলাশঝোপে ঢাকা মাঠটা পেরিয়ে অন্নদার টাঁড়ের জঙ্গলে উঠে ইন্দ্র থমকে দাঁড়াল। এতক্ষণে মনে পড়ল, সে কিসের ঝোঁকে দিনশেষে এই জঙ্গলটার দিকে এমন করে ছুটে এসেছে। সেই কিংবদন্তীর সৌরভ। মজহারউদ্দিন বলছিলেন, 'ভুলই যার সুখ, তার ভুল ভাঙতে নেই।' কিন্তু এমন করে ছুটে আসার পেছনে ইন্দ্রের সেই ভুল ভাঙার জেদ। এ থেকেই প্রজ্ঞার প্রতি তার প্রথম আঘাত শুরু হোক।

যে বন্যতা প্রজ্ঞার সংস্পর্শে ইন্দ্রের কাছ থেকে দূরে সরে গিয়েছিল, আজ তা আবার ফিরে এসেছিল। শুধু কাছাকাছি ফেরা নয়, আত্মার মধ্যে ঢুকে পড়া। ইন্দ্র হিংস্র প্রাণীর ভঙ্গিতে হাঁটছিল, সন্তর্পণে। যে ভঙ্গিতে শিকারের খোঁজে শ্বাপদ এগিয়ে যায়, কিংবদন্তীর সৌরভটির খোঁজে ইন্দ্রের সেইরকম যাওয়া।

খোলামেলা জায়গাটিতে ইন্দ্র কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল। যে কোনও জঙ্গলেরই একরকম গন্ধ আছে। ফুল, বৃক্ষলতা, মাটি ও জীবজগতের সংমিশ্রিত জটিল সেই গন্ধ। ইন্দ্রের কাছে তা স্বাভাবিক গন্ধ। অন্নদারানীর টাঁড়ের জঙ্গলে সূর্যাস্তকালের পৃথক গন্ধ, চাঁপাফুল কি আতরের, ইন্দ্রের ভয়েই কি আত্মগোপন করেছে ?

জঙ্গলের ভেতর দ্রুত আঁধার ঘনিয়ে আসছে। কোথায় সেই সৌরভ ? সৌরভটিকে ইন্দ্র হিংসা ও আকুলতায় আবিষ্কার করতে চাইছিল। সহসা মনে হল, প্রজ্ঞার মায়ের মন্দিরের চিহ্ন যেখানে পাওয়া গেছে, সেখানে গেলে কি তার মুখোমুখি হবে ?

নদীর কাছাকাছি ঘনঝোপে ঢাকা জায়গাটিতে পৌঁছেই ইন্দ্র চমকে উঠল। কী এক তীব্র ঘ্রাণ এতক্ষণে চারদিক থেকে তাকে ঘিরে ধরল। ঝাঁঝালো, নিষ্ঠুর, কটু আর জৈব সেই ঘ্রাণ।

ইন্দ্র অবাক হয়েছিল। এদিকটায় এখনও দিনশেষের আলো আছে। চাঁপা কি আতরের সৌরভের বদলে কুপিতা অন্নদারানী ইন্দ্রকে একটা কদর্য গন্ধ দিয়ে যেন চপেটাঘাত করছেন মুহুর্মুহু, ইন্দ্র তাঁর মেয়ের প্রতি বিরূপ বলেই কি ? ইন্দ্র শিউরে উঠল। কিছুক্ষণ ইতস্তত করল। তারপর ঝোপগুলির ভেতর ঢুকল। কটু জৈব গন্ধটির উৎস প্রজ্ঞার পুঁতে রাখা ত্রিশূলটির দিকে থেকেই আসছিল। হাওয়া রইছিল মন্দিরের ধ্বংসস্তূপের দিক থেকে। ত্রিশূলটি ধূসর আলোয় দেখতে পেল ইন্দ্র।

রাইফেলের নল দিয়ে সামনের ঝোপটি ঠেলে সরিয়ে পা বাড়াতেই ইন্দ্র প্রচণ্ড এক জৈব হুঙ্কার শুনতে পেল। কানে তালা ধরানো আকস্মিক বজ্রপাতের ভয়াবহ শব্দ। তারপর স্তূপের পেছনে হলুদ বিদ্যুৎরেখার ঝলকানি কালো মেঘের গায়ে। অন্নদারানীর জঙ্গল থেকে সূর্যাস্তকালীন কিংবদন্তীর সৌরভ ভয়ঙ্কর নির্দয় ধ্বনিতে রূপ নিচ্ছিল। মাটি এবং বৃক্ষলতার অতর্কিত জাগরণের মুহূর্তে সেই ষষ্ঠেন্দ্রিয়জাত বোধ বনচর ইন্দ্রকে নাড়া দিল। সে রাইফেলের নল সবে তুলেছে, দেবী অরণ্যানীর হিংস্র বাহন তার ওপর ঝাঁপ দিল।

পাটোয়ারিজি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে একটু কেসে সাড়া দিলে প্রজ্ঞা মুখ ফেরাল। লণ্ঠনটির দম কমানো ছিল। সে জানালার সামনে দাঁড়িয়ে ঢিবির নীচে অন্ধকার নদী দেখছিল। মুখ ফেরালে আবছা আলোয় তার ভিজে চোখদুটি পাটোয়ারিজির তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়াতে পারল না। তিনি অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, পণ্ডিতজির মেয়ের জীবনে এমন একটা সুখের সময় দুঃখের কী ঘটনা ঘটেছে ? তার মায়ের মাটির জরিপ হয়ে গেল, এ একটা আদত এবং বড় কাজ। সীমানার চৌহদ্দিও চিহ্নিত। আর কয়েকটা মাস পরে সেখানে মন্দির উঠবে। জঙ্গল হবে দেবীর আশ্রম। হ্যাঁ, একথা সত্য যে, দেবীর বেটিকে এখানকার লোকেরা ঝুটমুট বদনাম দেয়। অনেক কথা তাঁর কানে আসে। এমন কী, তাঁর বাড়ির লোকেরাও

দেবীর বেটিকে সুনজরে দেখে না। তিনি এ সকল কথা ভালই জানেন। কিন্তু সেজন্য মন খারাপ করার কিছু নেই। এই ঘরটা বাড়ির একটেরে। তাঁর নিজেরই থাকার ঘর। বেটি নিশ্চয় লক্ষ করেছে, এদিকটায় কেউ আসে না। কারণ তিনি বাড়ির কাউকে এ ঘরের দিকে আসতে বারণ করে দিয়েছেন। এমন কী, বেটির স্বপাক আহারের ব্যবস্থাও করেছেন।

প্রজ্ঞা লণ্ঠনের দম বাড়িয়ে পাটোয়ারিজিকে বসতে বলল। তিনি বসে সস্নেহে আবার বললেন, 'অব্ রোতি কিঁউ বেটি ?'

প্রজ্ঞা মৃদুস্বরে একটা আশ্চর্য কথা বলল। আজ জঙ্গল থেকে তার মা তাকে অনুসরণ করে এসেছে। এতক্ষণ জানালার ওধারে তার মা দাঁড়িয়ে ছিল এবং তার সঙ্গে কথা বলছিল। বিশ্বাস করা না করা পাটোয়ারিজির ইচ্ছা।

পাটোয়ারিজি জোড়াহাত কপালে ঠেকিয়ে বললেন, 'জরুর বিশোয়াস করতা।' তারপর একটু হেসে জানতে চাইলেন, দেবীর সঙ্গে দেবীর বেটির কী বাতচিত হল, বলতে আপত্তি আছে কিনা।

'নেহি পাটোয়ারিজি ! মা বোলতি থি তু তুরন্ত আকে মেরি গদিমে বৈঠ যা !'

পাটোয়ারিজি মাথা চুলকে বললেন, 'লেকিন জঙ্গলমে একেলি জওয়ান লড়কি ক্যায়সে···নেহি বেটি !' তিনি মাথাটি দোলাতে থাকলেন।

'পাটোয়ারিজি ! কুছ রুপেয়া উধার মাঙ্‌তি।'

পাটোয়ারিজি মুখের দিকে তাকালেন। একটু অবাক হয়ে বললেন, 'রুপেয়া ?'

'জি'।

'কিতনি ?'

প্রজ্ঞা একটু ভেবে বলল, 'পঁচাশ রুপেয়া।'

শুকনো হাসলেন পাটোয়ারিজি। 'ইতনি রুপয়োখি ক্যা জরুরত ?' বলে গম্ভীর হয়ে গেলেন।

প্রজ্ঞা শক্ত মুখে জানিয়ে দিল, বীরহাটা বাজারে ধার দেবার মতো মহাজন অনেক আছে। মজহারউদ্দিন খানকে বললে এখনই তার ব্যবস্থা করে দেবেন। ধার সে পাবেই, কারণ তার হাতে মাটি আছে। আর জঙ্গলে একা যুবতী মেয়ের ঘর বেঁধে বাস করার কথা বলছেন পাটোয়ারজি ! তিনি কি জানেন না এক বন্দুকবাজ তার প্রহরী ?

পাটোয়ারিজি বুঝলেন। একটু পরে কাঁচুমাঁচু মুখে জানালেন, বুড়ো হয়ে তিনি কারবারের সব দায়িত্ব ছেলেদের হাতে ছেড়ে দিয়েছেন। তাঁর নিজস্ব কিছু

তহবিল আছে সত্য, যা থেকে আমিনবাবুকে জরিপের টাকা মিটিয়ে দিয়েছেন এবং কয়েক মাস পরে দেবী অরণ্যানীর মন্দির গড়ার ইচ্ছাও আছে। কিন্তু ধারের ব্যাপারটা কারবারের আওতায় পড়ে। দেবীর বেটিকে তিনি জঙ্গলে বসত করার জন্য এই তহবিল থেকেই টাকা দিতে বা যে কোনও সাহায্য করতে প্রস্তুত। অথচ তাঁর এ কাজ অনৈতিকই হবে। জঙ্গলে অবিবাহিতা যুবতী এবং তার বন্দুকবাজ প্রহরী, এটা তাঁর পক্ষে মেনে নেওয়া কঠিন। এ অবস্থায় বেটি যখন জেদ করছে, তখন তাঁর কিছু বলার নেই। বড় ছেলে রণজয়কে পাঠিয়ে দিচ্ছেন। তার সঙ্গে বেটি কথা বলুক। তবে এও তাঁর বলা কর্তব্য, ধারের টাকার সুদটা একটু চড়া। কারণ খরার মাস আসন্ন। আর একটি বলার কথা। তমসুকে সই না করলে কেনও মহাজনই টাকাকড়ি ধার দেন না।

প্রজ্ঞা যখন রণজয়কে ডেকে দিতে বলল, তখন তার মনে বন্দুকবাজ প্রেমিক যুবকটির চিত্র স্থির ছিল। ইন্দ্র থাকতে তার ভয় কিসের ? পৃথিবীর কেউ তার মাটিতে হাত বাড়াতে সাহস পাবে না। আর ওই হিংস্র বাহন।...

॥ ৮ ॥

দেবীর বাহন সে, এবং সেই দেবীর নাম অরণ্যানী, বাঘটি এসব কথা জানত না। কিছুদিন থেকে এক বন্দুকবাজের তাড়া খেয়ে সে অতিষ্ঠ ছিল। ক্ষুৎকাতরতা তাকে ক্রমশ মরিয়া এবং আরও হিংস্র করেছিল। শেষ রাতে ইদানীং ঘন কুয়াশা জমে ওঠে। সেই সুযোগে বাথানের একটি সদ্যোজাত ছটফটে বাছুর যদি বা তার পাল্লায় পড়ে, পুরো মাংসটা খাওয়ার আগেই আবার বন্দুকের শব্দ। সে পালিয়ে গিয়েছিল। ওই শব্দের সঙ্গে তার চোয়ালে একটি দারুণ যন্ত্রণার কার্যকারণ সম্পর্ক সে আঁচ করেছিল। দুঃখের ব্যাপার, পরে চুপিচুপি এসে সে দ্যাখে, ফেলেযাওয়া মাংসটুকু আর নেই। একটি বয়স্ক প্রাণী সে। ভালই জানে, খাদ্য লুকিয়ে না রাখলে শেয়াল বা শকুনের পাল তা আত্মসাৎ করবেই।

বিষন্ন বাঘটি সারাদিন ধরে খাদ্য খুঁজে হন্যে। শেষে দেবীর জঙ্গলের কাছাকাছি আসে। জঙ্গলের ঢালের নীচে নদী এবং সামান্য দূরে একটি দহ আছে। কুলখাড়ি-শেতলদ'র রাখালেরা বাড়ি ফেরার সময় গোরুগুলিকে সেই দহের জল খাইয়ে নিয়ে যায়। বাঘটি সূর্যাস্তের আগেই দেবীর জঙ্গলে ঢোকে। তখন জঙ্গল ছিল স্তব্ধ আর জনহীন। ঢালের দিকে ঝোপের আড়ালে সে ওত

পেতে বসে ছিল। কিন্তু সে জানত না, ততদিনে তার প্রচণ্ড বদনাম ছড়িয়ে পড়েছে। তাই রাখালেরাও দিনের আলো থাকতে থাকতে পাল ডাকিয়ে বাড়ি ফেরে।

ক্ষুধার্ত এবং হতাশ এক বাঘ। সহসা পিছনে শুকনো পাতার মচমচ শব্দ, ঝোপগুলিও দুলছিল। দ্রুত ঘুরেই তার চোখে পড়ে জঘন্য একটি জিনিস, সেই বন্দুকবাজের মাথাটি। মুহূর্তে সে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল। আতঙ্ক এবং হিংস্র আকস্মিক প্রতিক্রিয়া মাত্র।

ধারালো থাবার আঘাতে মাথার খুলি ফেটে যায়। ধরাশায়ী বন্দুকবাজের শরীর স্থির না হওয়া পর্যন্ত সে বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকে। তারপর অন্যমনস্কভাবে থাবা চেটে পরিচ্ছন্ন করছিল সে, ঘৃণায়। কিন্তু বন্দুকবাজের রক্তের স্বাদ তাকে ক্রমশ আবিষ্ট করছিল। একটু ইতস্তত করে সে রক্তাক্ত মাথাটির কাছে মুখ নিয়ে যায়। আরও মোহাবিষ্ট হতে থাকে। উত্তেজক এক নতুন স্বাদে বিহ্বল সে, তার পাকস্থলীও হাহাকার করে উঠেছিল।

এই প্রথম সে মানুষের রক্ত-মাংসের মিষ্টতা টের পায়। চোয়ালে যন্ত্রণা, তাই থাবা দিয়ে ছিঁড়ে ছিঁড়ে সে মাংসের চাবড়া ছাড়িয়ে গিলতে থাকে। বন্দুকবাজের পোশাক ফালাফালা করে সে শুধু সুস্বাদু মাংসই ছাড়িয়েই নিচ্ছিল হাড় থেকে।

অনেকখানি খাওয়ার পর সে বিশ্রাম নেয়। তারপর শেয়াল ও শকুনগুলির কথা মনে পড়ে যায়। সে বাকি মাংস ও হাড় টানতে টানতে তফাতে নিয়ে যায়। সেখানে প্রচুর শুকনো পাতা ছিল। পাতাগুলি জড়ো করে যত্নে সেটি ঢাকে। নিশ্চিন্তে জঙ্গল থেকে বেরিয়ে নদীতে জল খায়। ফিরে এসে সে কাছাকাছি একটি গাছের আড়ালে পেছনকার দুই পা মুড়ে বসে থাকে। সারাটি রাত যতবার শেয়ালের পাল ডেকে উঠছিল, সে গরগর চাপা গর্জনে তাদের সাবধান করে দিচ্ছিল।

সূর্য ওঠার পর আবার তার খিদে পায়। পাতাগুলি সরিয়ে সে খাওয়ায় মন দেয়। খাওয়া শেষ হলে সে শুয়ে পড়ে। এবার তার ঘুম পেয়েছিল। গাছপালার ফাঁক দিয়ে ছড়িয়ে পড়া বসন্তরৌদ্রে তর শরীরের লাবণ্য ঝলমলিয়ে উঠেছিল। এতক্ষণে যথাযথ আরণ্য সৌন্দর্য তাকে দেবী অরণ্যানীর বাহন হওয়ার যোগ্যতা দিয়েছিল। আর তার এই যোগ্যতার গুণে বৃক্ষলতার শব্দে তখনই ঘোষিত হয়েছিল, এ এক নিষিদ্ধ অরণ্য।

কতক্ষণ পরে তার ঘুম ভেঙে যায়। কেউ চিৎকার করে ডাকছিল, 'ইন্দ্র! ইন্দ্র! ইন্দ্র!'

বাঘটি নিঃশব্দে উঠে দাঁড়ায়। তার জ্বলজ্বলে চোখে বিস্ময় ফুটে ওঠে। সকালবেলার জঙ্গলের নৈঃশব্দ্য ছিন্নভিন্ন করে আর্ত চিৎকার, 'ইন্দ্র ! ইন্দ্র ! ইন্দ্র !' নিষিদ্ধ অরণ্যে এই ধ্বনি ক্রমশ তীব্র হয়ে ওঠার পর প্রহরী বাঘটি চাপা গর্জন করে সাড়া দেয়। তারপর তেড়ে যায়। তীক্ষ্ণাগ্র একটি ত্রিশূলের খোঁচা খেয়ে পিছিয়ে আসে। এবার সে নিষ্ঠুর গর্জন করে ঝাঁপ দেয়, আবার ত্রিশূলের খোঁচা খায়। তার পাশব সহ্যের সীমা পেরিয়ে গেলে তৃতীয়বার সে ঝাঁপ দিল এবং দ্বিপদ আশ্চর্য প্রাণীটি তার করায়ত্ত হল। গর্জনের পর গর্জনে সে ক্ষতবিক্ষত করতে থাকল ধরাশায়ী আরেক মানবশরীরকে। সারা জঙ্গল কেঁপে উঠছিল গর্জন ও আর্তনাদে।

সেইসময় বাঘটি সহসা অনুভব করেছিল, এই শরীরটিতে কিছু কোমলতা আছে এবং অন্য কী এক স্বাদ আর গন্ধও। সে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে দেখছিল রক্তাক্ত কোমলতাকে।

সবে গদি খুলেছে। কিন্তু তখনও পাটোয়ারিজি গদিতে যাননি। মজহারউদ্দিনকে দেখে যথারীতি খাতির করে বসার ঘরে ঢোকালেন। তাঁকে অত্যন্ত গম্ভীর দেখাচ্ছিল। পাটোয়ারিজি বললেন, 'বসুন খানসাহেব !'

মজহারউদ্দিন বসলেন না। বললেন, 'পণ্ডিতজির মেয়ের সঙ্গে একটু কথা ছিল।'

পাটোয়ারিজি হাত নেড়ে বললেন, 'ওর কথা আর বলবেন না খানসাহেব ! সিরফ্ পাগলি মেয়ে। নিজের খেয়ালে চলে। কিছুক্ষণ আগে একা-একা মায়ের জঙ্গলে চলে গেল। সঙ্গে লোক দিতে চাইলাম। নিল না।'

মজহারউদ্দিন আস্তে বললেন, 'কেন গেল বলে যায়নি আপনাকে ?'

পাটোয়ারি বাঁকা হাসলেন। 'পাগলি ! সিরফ্ নাদান। জঙ্গলে ঘর বানিয়ে থাকবে। রাতে আমাকে হাওলাত চাইল। খড়বাঁশ কিনবে। তো আপনি জানেন, হাওলাতি কারবার আমার ছেলেরাই করে। রণজয়কে ডেকে দিলাম। তার কাছে পঞ্চাশ টাকা হাওলাত নিল।'

'হাওলাত !' মজহারউদ্দিন চমকে উঠেছিলেন। 'তমসুকে নাকি ?'

'হ্যাঁ। হাওলাতের টাকা হলে তমসুকে দস্তখত দেওয়াই তো রেওয়াজ।'

'তমসুকে দস্তখত করেছে পারু ?'

পাটোয়ারিজি একটু বিরক্তির ভাব দেখিয়ে বললেন, 'আমি আর এসবে নেই। আমার সঙ্গে কথা বলাও ফালতু কাজ। রণজয়কে পুছে সব জেনে নিন।'

মজহারউদ্দিন একটু চুপ করে থাকার পর বললেন, 'তমসুকে জামিনদার লাগে। কে জামিনদার হল পারুর ?'

পাটোয়ারিজি নিরাসক্তভাবে বললেন, 'গহনা বা জমিন যার থাকে না, তার জামিনদার লাগে। পণ্ডিতজির বেটির অনেক জমিন আছে। সেই জমিনের দলিল আছে।'

'তা হলে অন্নদারানীর টাঁড় জামিন রেখে তার মেয়ে হাওলাত করেছে ?' মজহারউদ্দিন ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বরে বললেন, 'অতখানি মাটি বাঁধা রেখে পঞ্চাশটা টাকা ! পাটোয়ারিজি, আপনি এ কী করলেন ?'

হাত তুলে নাড়তে নাড়তে পাটোয়ারিজি বললেন, 'আমাকে কিছু বলবেন না খানসাহেব ! আমি মানা করেছিলাম। কথা শুনল না। আপনি রণজয়কে পুছ করুন। পণ্ডিতজির বেটিকে পুছ করুন। বেটি আমাকে বেইজ্জত করতে চাইছিল। বলছিল কী জানেন ? বীরহাটায় অনেক মহাজন আছে, হাওলাতি কারবার করে তারা। এখানে হাওলাত না পেলে অন্য গদিতে যাবে। এবার বলুন, আমার কী গলতি হয়েছে এতে ?'

মজহারউদ্দিন বেরিয়ে এলেন ঘর থেকে। বাজারের এটি শেষপ্রান্ত, নীচে নদী। সকালে এখন ভিড় কম। পাটোয়ারিজির বাড়ির একটা অংশে গদি। গদিতে ঢুকে রণজয়ের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন মজহারউদ্দিন। রণজয় সিং পাটোয়ারি মুখ তুলে তাঁকে দেখে একটু হাসল। 'আসুন খানসাহেব ! বসুন !'

উঁচু তক্তাপোসে তোশকের ওপর ধবধবে শাদা চাদর পরিপাটি করে বিছোনো আছে। কয়েকটি তাকিয়া এখানে-ওখানে ছড়ানো। পা ঝুলিয়ে বসে মজহারউদ্দিন বললেন, 'পণ্ডিতজির বেটি পঞ্চাশ টাকা হাওলাত নিয়েছিল। টাকাটা ফেরত দিতে এলাম।'

রণজয় ভুরু কুঁচকে বলল, 'তার টাকা আপনি ফেরত দিতে এলেন ?'

'হ্যাঁ।' মজহারউদ্দিন একটু হাসলেন। 'যদি একরাতের জন্য কিছু সুদ পাওনা হয়, তাও দিচ্ছি।'

'বুঝলাম না খানসাহেব !'

'না বোঝার কী আছে ? তমসুক ফেরত দাও, টাকা ফেরত নাও।'

রণজয় হা হা করে হাসতে লাগল। 'হাওলাত করেছে একজন, হাওলাত শোধ দিতে এল আরেকজন। মনে হচ্ছে, খানসাহেবও হাওলাতি কারবার খুলেছেন।'

'তুমি তা হলে তমসুক ফেরত দেবে না ?'

রণঞ্জয় এই উষ্ণ বাক্যে এতটুকু বিচলিত হল না। বলল, 'আজিব বাত খানসাহেব! তমসুকে কি আপনার দস্তখত আছে যে আপনি টাকা দিলেই আপনাকে ফেরত দেব?'

মজহারউদ্দিন উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'ঠিক আছে। যে দস্তখত করেছে, তাকেই পাঠিয়ে দেব তা হলে।'

রণজয় জবাব দিল না। জাবদা খাতার ওপর ঝুঁকে পড়ল। ধবধব শাদা চাদরের পরিপ্রেক্ষিতে নির্বিকার এক মহাজনের পাষাণ ভাস্কর্যটি আড়চোখে একবার লক্ষ করলেন মজহারউদ্দিন। বীরহাটার শাক্ত মাটির পক্ষে মানানসই। 'এখানকার দেবদেবীরা রক্ত খায়।' গুনু বলেছিল, মনে পড়ে গেল এ মুহূর্তে। এও মনে পড়ল, পাটোয়ারিজি পিঁপড়ের গর্তে নাকি চিনি ছড়ান এমতো জনরব আছে। দেবীর বাহনকেও চিনি খাওয়ানোর কথা বলেছিল গুনু। আশ্চর্যভাবে মিলে যাচ্ছে সব কথা। চিনির সঙ্গে রক্তের এ এক অদ্ভুত সম্পর্ক বটে।

কিন্তু নিজেই মারাত্মক ভুল করে বসেছেন, এতক্ষণে সেটা স্পষ্ট। কাল সন্ধ্যায় প্রজ্ঞাকে পুরনো আর গোপন কথাটি কেনই বা সহসা জানিয়ে দিলেন? যা প্রায় তিরিশ বছর ধরে চাপা ছিল, আমৃত্যু চাপা দিয়ে রাখলে কারও কোনও ক্ষতি হত না।

আসলে প্রজ্ঞা পূর্বজন্মের সম্পর্কের কথা তোলায় নেহাত আবেগবশে হঠকারিতা ঘটে গেছে। দুঃখিত মজহারউদ্দিন আস্তে হাঁটছিলেন। বাজার এলাকা ছাড়িয়ে ডাইনে আগাছাঢাকা জমির ভেতর পায়ে চলা রাস্তায় পৌঁছুলে গুনুর সঙ্গে দেখা হল। সে হন্তদন্ত আসছিল। মুখোমুখি হলে গুরুপ্রণামীর পর ফিক করে হাসল।

মজহারউদ্দিন বিরক্ত হয়ে বললেন, 'তুই নরসুন্দরের পো। সব তাতেই তোর ধূর্তামির হাসি।'

'হাসির কারণ হলেই মানুষ হাসে।'

'ধুস শালা! এখন হাসির সময় নয়। ওদিকে এক কাণ্ড।'

'ওদিকের কাণ্ডটা জানি না, তবে এদিকেও এক কাণ্ড। তাই ওস্তাদজিকে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।'

'আগে তোর দিকেরটাই শুনি।'

গুনু ওস্তাদজির পেছনে এসে বলল, 'চলুন। যেতে যেতে বলছি।' তারপর খিক খিক করে হাসতে লাগল। ওস্তাদজি ঘুরে চোখ কটমটিয়ে তাকালে সে বলল, 'পণ্ডিতমশাই এসেছেন।'

মজহারউদ্দিন থমকে দাঁড়িয়ে গেলেন। "পণ্ডিত এসেছে! তাতে তোর এত হাসি কেন রে?'

গুনু বলল, 'কাছারিবাড়ির ফটকের সামনে সে এক দেখার মতো যুদ্ধ। দারোয়ানরা ঢুকতে দেবে না। দেওয়ানবাবুর কড়া হুকুম। ফটক বন্ধ করলে পণ্ডিত মশাই দমাদ্দম লাথি মারছেন, এমন সময় আমি গিয়ে পড়লাম। বুঝিয়ে সুঝিয়ে আপনার আখড়ায় নিয়ে আসছি, তখন দেখি খোঁড়াচ্ছেন। বুঝলেন না? লাথি মেরে পায়ের অবস্থা...' আবার খুব হাসতে লাগল গুনু। 'তো বললাম, আপনি বামুন মানুষ। পায়ে হাত দিলে স্বগগে যাব। পা ডলে দিই। আরও বললাম, হাড় নড়ে গেলে বসিয়ে ঠিকঠাক করে দেওয়ার বিদ্যা জানা আছে। জেতে নরসুন্দর। ফোঁড়া কাটি। হাড় বসাই। কৈ, পা দিন।'

পণ্ডিতের ফিরে আসায় মজহারউদ্দিন খুশি হয়েছিলেন। আগের দুঃখটা মুছে গেল। বললেন, 'পা ডলে দিলি?'

'নাঃ! পায়ের দিকে গেলেই পা ছোড়েন। শেষে বললেন, তোমার ওস্তাদজিকে দেখ, কোথায় আছেন।'

বারান্দার নীচে পাথরটার ওপর ঘন ছায়া পড়েছে। সেই পাথরে বসে ছিলেন পণ্ডিত। মজহারউদ্দিনকে দেখেই ক্রুদ্ধ স্বরে বললেন, 'বাড়ি ঢুকতে দিলে না। আমার জিনিসপত্র নিতে এসেছি বললাম। তো কথা কানেই করল না। মুখের ওপর ফটক বন্ধ করে দিল। নির্বোধ মেয়েটাকে গিলে নিয়েছিস। তাতে দুঃখ নেই। কিন্তু আমার বইপত্রের বোঁচকাও গিলে খাবে?'

মজহারউদ্দিন ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তা হলে তুই বইয়ের বোঁচকা নিতেই এসেছিস? আবার কোথায় পণ্ডিতি জোটালি?'

'নওলপাহাড়িতে চতুষ্পাঠী খুলব। চেনা জায়গা। এখানকার মতো অমানুষের পাল নেই।'

'মেয়ের কী হবে?'

পণ্ডিত বিকৃত মুখে বললেন, 'মেয়ের তো মায়ের রাস্তা ধরেছে। যা খুশি করুক গে। তোর মতো মুরুব্বিও পেয়ে গেছে। আমার এখন মুক্তি।'

মজহারউদ্দিন উঁচু বারান্দার নগ্ন মাটিতে বসতে যাচ্ছিলেন। গুনু বলল, 'চাবি দিন। আসন বের করে দিই।' মজহারউদ্দিন কানে নিলেন না। মাটিতে বসলেন।

পা দুটো দোলাতে দোলাতে বললেন, 'তুই এক পণ্ডিত। তোর মেয়েও এক পণ্ডিত। তোর পেটে বিদ্যা গজগজ করছে। কিন্তু বুদ্ধির ঘরে গোল্লা। হ্যাঁরে,

এটুকু বোঝবার মতো বুদ্ধি তোর নেই যে অমন একটা কাণ্ডের পরও কাছারিবাড়িতে আর তোদের বাপ-বেটির ঠাঁই হবে ?'

গণেশ লালকর শাস্ত্রী নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'বের করে দিয়েছে ?'

মজহারউদ্দিন গুনুকে বললেন, 'পণ্ডিতের মুখ দেখে মনে হচ্ছে পেটে দানাপানি পড়েনি। এই নে পয়সা। বাজারে গিয়ে মাটির সরা কিনে দই চিড়ে কলা-টলা এনে দে। বামুনের ফলার না হলে তোরই পাপ। আমি মোছলমানের পো, তাতে পাঠানবাচ্চা। আবার লবডংকাটি !'

গণেশ শাস্ত্রী গলার ভেতর বললেন, 'আমি কিছু খাব না। আমার জিনিসপত্র নিয়েই চলে যাব।'

মজহারউদ্দিন বললেন, 'থাম রে শালা! নওলপাহাড়ি কি এখানে ? গুনু, যা বাপ।'

গুনু চলে গেলে পণ্ডিত বললেন, 'বীরহাটার অন্নজল আমি ছোঁব না। ফলার তুই-ই করিস। শুধু দয়া করে বল, আমার জিনিসপত্র নিয়ে হারামজাদি মেয়ে কোথায় তুলেছে ?'

'পাটোয়ারিজির ঘরে।' মজহারউদ্দিন এবার গম্ভীর হলেন। 'বীরহাটায় সে ছাড়া তোর মেয়েকে ঠাঁই দেবার কেউ ছিল না। ইন্দ্রের কথা বলবি। তার যত সাহস আর গোঁয়ারতুমি জঙ্গলে। বীরহাটায় তার বাপ-মায়ের বাড়ি মাত্র। বিরাট দালানবাড়ি বটে, কিন্তু সেখানে তোর মেয়েকে নিয়ে গিয়ে তুললে মেয়ের একশো খোয়ার হত। সেটা ইন্দ্র যেমন জানে, তোর মেয়েও জানে। হ্যাঁ, ইন্দ্র একটু সাহস দেখিয়ে তোর মেয়েকে ডেকেছিল সত্য। বাপের সঙ্গে হেস্তনেস্ত করতে চেয়েছিল, তাও সত্য। কিন্তু পারুবেটি রাজি হয়নি। কেন হবে ? জঙ্গলের দেবী হয়ে মায়ের মতো জঙ্গলের পাটায় বসবে। ইন্দ্র তার পুজোআচ্চা করবে। আমি গিয়ে সরগম ভেঁজে বন্দনা গাইব।'

গণেশ শাস্ত্রী বিরক্ত হয়ে বললেন, 'চুপ করবি ?'

'তুই মারাঠাবাচ্চা। তুই বড় পাষাণ রে ! বর্গীর স্বভাব।' মজহারউদ্দিন একটু হাসলেন। 'নিজের জিনিস লুঠ হতে দেখলে তোর বুকে বেশি কষ্ট বাজে। লখনউয়ের বাইজিমহল্লার নাচুনি হীরাবাইকে যখন লুঠ করেছিলি, আমার ওস্তাদ দীনদয়ালজির বুকের কষ্ট আমল দিসনি !' মজহারউদ্দিন দুই কানের লতি ছুঁলেন।

গণেশ লালকর শাস্ত্রী চমকে উঠেছিলেন। ভাঙ্গা গলায় বললেন,

'মজহারউদ্দিন ! তুই জানিস তা হলে ?'

'জানি, চেপে রেখেছিলাম। ওস্তাদজি হীরাবাইকে চিত্তশুদ্ধির জন্য তীর্থে নিয়ে গেলেন। তুই ছিলি তাঁদের পাণ্ডা। তোর মুখ আমার মনে গাঁথা ছিল রে ! হরিদ্বার থেকে ওস্তাদজি একা ফিরে এলেন। মুখে কষ্টের ছাপ। তিনদিন ধরে সাধাসাধির পর সব খুলে বললেন। তিরিশ বছর আগের কথা। কিন্তু আশ্চর্য, তোর ওই মুখ যে জীবনে একবার দেখবে, সে-ও বোধ করি ভুলতে পারবে না।'

পণ্ডিতের চোখ ভিজে গেল। আস্তে বললেন, 'কী আছে আমার মুখে ?'

'কী যেন আছে।' মজহারউদ্দিন হাসলেন। 'তোকে আমার চেনা মনে হয়েছিল। তারপর তোর মেয়েকে দেখলাম। খুঁটিয়ে খুব কাছ দেখার পর তার মুখে হীরাবাইয়ের স্পষ্ট আদল খুঁজে পেলাম। সব পরিষ্কার হয়ে গেল তখন।'

একটু পরে পণ্ডিত গণেশ লালকর শাস্ত্রী বললেন, 'আমি পারুকে তার মায়ের আসল পরিচয় এবার জানিয়ে যাব।'

'সে জেনে গেছে।'

'কে বলল ?'

মজহারউদ্দিন দুই কানের লতি ছুঁয়ে বললেন, 'কাল সন্ধ্যায় ওস্তাদজির আত্মা আমার মুখ দিয়ে বলিয়ে ছাড়লেন। আমার ধন্দ লাগছ। কেন ওকে সে কথা বলে ফেললাম ? যদি না বলতাম, তা হলে জঙ্গলের দেবীর পায়ের তলা থেকে পাটা খসে যেত না। পণ্ডিত ! তোর অবুঝ মেয়ে তার জঙ্গল তমসুকে জামিন দিয়ে টাকা হাওলাত করেছে। সে জঙ্গলে গিয়ে ঘর বাঁধবে ! সে এক বাঈজির মেয়ে, এ কথা শুনেই সে আমার ওপর খেপে গেছে।'

গণেশ শাস্ত্রী বললেন, 'মরুক হারামজাদি ! বেশ্যার পেটের বেশ্যা...'

'চুপ শালা ! জিভ কেটে ফেলব। ঘরে তলোয়ার আছে।'

গণেশ শাস্ত্রী উঠে দাঁড়ালেন। 'চল। পাটোয়ারিজিকে বলে আমার বোঁচকা বের করে দিবি। আমার অসহ্য লাগছে।'

'তার আগে তোর মেয়ের সঙ্গে তোর একবার দেখা করা দরকার।'

'আমি আর তার মুখদর্শন করতে পারব না। ওঠ্।'

মজহারউদ্দিন উঠে গিয়ে তাঁর দু কাঁধ ধরে জোর করে বসিয়ে দিলেন। বললেন, 'তুই কী মানুষ রে ! একথাটার জবাব দে। কেন তার কাছে ছোটবেলা থেকে তার মায়ের অমন মূর্তি গড়েছিলি ?

কেন হীরাবাঈয়ের রক্তমাংস দিয়ে অন্নদারানীর দেবীপ্রতিমা বানিয়েছিলি ? আহাম্মক ! তুই এখন মেয়েকে বেশ্যার পেটের বেশ্যা বলে গাল দিচ্ছিস। কী

দোষ করেছে তোর মেয়ে ? মা যার কাছে দেবী, সেও নিজেকে দেবী ভাববে। মায়ের পাটায় বসতে চাইবে। এ জন্য দায়ী তো তু-ই। কেন মেয়েকে তার মায়ের আসল পরিচয় দিসনি ?'

পণ্ডিত মুখ নামিয়ে বসে রইলেন।

মজহারউদ্দিন বললেন, 'ঘৃণা রে, ঘৃণা ! হীরা বাঈকে তার মেয়ের চোখে দেবী বানানোর পেছন ছিল তোর সাংঘাতিক ঘৃণা। ব্যঙ্গ করে আজগুবি সব গপ্প বলতিস আর সরলমনা মেয়ে তা সত্যি বলে ভাবত।'

পণ্ডিত মুখ নামিয়ে রেখেই ভাঙা গলায় বললেন, 'পারু কোথায় ?'

'মায়ের পাটায় বসতে গেছে।'

'খানকির টাঁড়ে ?

মজহারউদ্দিন কষ্টে হাসলেন। 'বেশ। তা-ই ! তবে জানিস কি খানকির টাঁড়ে সন্ধ্যাবেলায় নাকি কী এক সুবাস ছোটে ? হিন্দুরা বলে, চাঁপার গন্ধ। মুসলমানরা বলে আতরের।'

'সুবাস ছোটারই কথা। খানকিরা সন্ধ্যাবেলা সেজেগুজে গায়ে গন্ধ মাখে।' পণ্ডিত সশব্দে নাক ঝেড়ে বললেন। গলা চিড় খাওয়া। ' বাঈজিমহল্লায় এক ওস্তাদ গাইয়ের সাগরেদি করতিস। তুই ছাড়া এসব কথা কে বেশি জানবে ?'

মজহারউদ্দিন কানে হাত রেখে গুনগুন করে গেয়ে উঠলেন, 'সজনুয়া রে/ক্যায়সে বাটাউঁ তেরে বিনা রাতিয়া···' নিঝুম পারিপার্শ্বিকে ক্রমে একটা ব্যকুলতা সঞ্চারিত হতে থাকল। ধূপের ধোঁয়ার মতো সুরের কুয়াশা শেষ বসন্তের উজ্জ্বলতাকে ঢেকে ফেলছিল। 'তেরে বিনা রাতিয়া সজনুয়া রে/ক্যায়সে কাটাউঁ/আ মেরে সজনুয়া···' সুদূর স্মৃতির দিকে আবছা ঝুমঝুম পাঁয়জোরের ধ্বনি। ক্রমে ধ্বনি নিকটতর।

গণেশ লালকর শাস্ত্রী দুই কানে আঙুল গুঁজে দিলেন। গায়ক গান থামিয়ে বললেন, 'ঠুমরি গেয়ে হীরা বাঈকে তোর সামনে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছিলাম। পাঁয়জোরের বাজনা এখনও থামেনি, তা তুই যতই কানে আঙুল গুঁজে দে। তোর বুকের ভেতর নাচছে রে ! পণ্ডিত, এই তল্লাটের লোকে বলে, অন্নদারানীর ভর উঠত। সে তার শেষ নাচের ছাঁদ। ভরতমুনির শাস্ত্রে বলে নাচের মুদ্রার কথা। কিন্তু এই মুদ্রার কথা কোনও মুনির শাস্ত্রে লেখা নেই। তবে কথাটা হল, শেষ নাচ সে হরনাথ চৌধুরির বুকে দাঁড়িয়ে নেচে গেছে। বীরহাটা শাক্তদের মাটি। শিব শব হয়ে পড়ে থাকে। বুকে ন্যাংটা কালীর নাচ।'

'তুই আমাকে তলোয়ারের খোঁচা মারবি জানলে তোর কাছে আসতাম না !'

বলে গণেশ শাস্ত্রী আবার নাক ঝাড়লেন। ভিজে চোখ। চোখদুটি লাল।

'গাইয়ে হলে কী হবে ? এ শালা এক পাঠানবাচ্চা। স্বভাব যাবে কোথায় ?' পকেট থেকে রুমাল বের করে গায়কও নিজের ভিজে চোখদুটি মুছলেন।

'মজহারউদ্দিন !'

গায়ক অন্যমনস্কভাবে সাড়া দিলেন। দূরে দৃষ্টি, মুখে বিষাদের গাঢ় ছাপ।

গণেশ লালকর শাস্ত্রীর ঠোঁট কাঁপছিল। আস্তে বললেন, 'পারুকে তার মায়ের পরিচয় তুইই দিয়েছিস। এবার এই কথাটাও তাকে জানিয়ে দিস, সে আমার মেয়ে নয়। আমার ঔরসে তার জন্ম হয়নি।'

মজহারউদ্দিন একটুও চমকে উঠলেন না। নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে বললেন, 'জানি।'

'হুঁউ। তুই জানবি বৈকি।'

'ওস্তাদজি কেন তাকে তীর্থে নিয়ে গেলেন, তাও আমি জানতাম।

'কিন্তু তুই জানিস কি, কেন হীরাবাঈ রাতারাতি আমার সঙ্গে পালিয়ে এসেছিল ?' গণেশ লালকর শাস্ত্রী মাথা নেড়ে বললেন, 'তুই জানিস না। কিন্তু তুই পাঠানবাচ্চা, আমার ভয় হচ্ছে, কথাটা বললে সত্যি তলোয়ারের কোপ মারবি।'

মজহারউদ্দিন সোজা হয়ে বসলেন। একটু হাসবার চেষ্টা করে বললেন, 'নাঃ ! যে হাত বীণার তারে সঁপেছি, সেই হাতে তলোয়ার ধরলে পাপ হবে। তবে জন্মেছি মুসলমানের ঘরে। আল্লাখোদাও ভজি। মুসলমানের শাস্ত্রে আছে, নিজের জান বাঁচানো ফরজ কাজ। ফরজ কী জানিস ? যা অবশ্য-অবশ্য মানতে হবে। খোদার এক নম্বর হুকুম। তাই ঘরে একখানা তলোয়ার রেখেছি। পণ্ডিত ! এখনও আমাকে আরও অনেকদিন বেঁচে থাকতে হবে, ভাই ! হীরা বাঈজির মেয়েকে জঙ্গলের পাটায় যতদিন না বসাতে পারছি, ততদিন।'

'হীরা আমাকে বলেছিল, তার ভয় হচ্ছে, ওস্তাদজি তাকে ধাক্কা মেরে পাহাড় থেকে ফেলে দেবেন।'

'হীরা বলেছিল ?'

'হ্যাঁ। কেন, জিজ্ঞেস করলে তখন বলল, সে পাপ করেছে। ওস্তাদ দীনদয়ালজি তাকে আগলে রাখতেন। কিন্তু বাঈজিমহল্লায় কে কাকে আগলে রাকবে ? হীরা পাপ করেছিল। সেই পাপের বোঝা নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছিলাম। এ কি অন্যায় ?'

মজহারউদ্দিন রাস্তার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'নরসুন্দরের পো গেল তো

গেলই। আসবার নাম নেই। অনেক বেলা হয়ে গেল। পারুকে জঙ্গল থেকে ডেকে এনে তমসুক ফেরত নিতে হবে। তুইও সঙ্গে যাবি।'

'আমি পারুর কাছে যাব না। কেন যাব ? তার সঙ্গে আমার কিসের সম্পর্ক ?'

'তার বাপ নোস বলে ?' মজহারউদ্দিন বাঁকা হাসলেন। 'বাপ নোস্, অথচ আড়াই বছরের বাচ্চা মেয়েকে মায়ের কাছ থেকে চুরি করেছিলি। লালনপালন করেছিস বাইশ-তেইশটা বছর। বাপ কাকে বলে রে ?'

গণেশ লালকর শাস্ত্রী ফুঁসে উঠলেন। 'হারামজাদি বাঈজিকে কষ্ট দেবার জন্য পারুকে চুরি করেছিলাম। তবে কাজটা খারাপ করিনি। লেখাপড়া শিখিয়েছি। শাস্ত্র দেবভাষা পড়িয়ে তাকে বিদূষী করেছি। কিন্তু শরীরে বেশ্যার রক্ত ! ঠিক মায়ের মতোই।...'

থেমে গেলেন হঠাৎ। কাছারিবাড়ির দিকে একটা হল্লার শব্দ। ফটকের কাছে কিছু লোক জড়ো হয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে রইলেন। হল্লাটা ক্রমশ বেড়ে চলেছে। ফটকের কাছে আরও লোক দৌড়ে আসছে।

মজহারউদ্দিন বললেন, 'কী গণ্ডগোল হয়েছে যেন। জমিদারি কারবার। দাঙ্গা ফ্যাসাদ লেগেই আছে সবসময়।'

এইসময় গুনু এল হাঁফাতে হাঁফাতে। 'ওস্তাদজি ! বাঘ।' বলে সে মাটির পাত্রটি বারান্দায় রাখল। উত্তেজনায় সে কাঁপছিল।

মজহারউদ্দিন বললেন, 'বাঘ ? বীরহাটায় বাঘ কী রে ?'

গুনু উত্তেজিত ভাবে বলল, 'অন্নদামায়ের জঙ্গলে, ওস্তাদজি ! ইন্দ্রবাবুকে খেয়েছে। বন্দুক পড়ে ছিল থানের কাছে। শেতলদ'র শশর মেয়ে আলো থানে পুজো দিতে ঢুকেছিল। দ্যাখে, বন্দুক পড়ে আছে। আর চাপ চাপ রক্ত। শেষে একটা ত্রিশূল। ছেঁড়া শাড়ি। বাঘের গজরানি।' সে অগোছাল বাক্যবন্ধে ঘটনাটি বোঝাতে চেষ্টা করছিল।...

অন্নদার জঙ্গলে বন্দুক। ত্রিশূল। ছেঁড়া শাড়ি। বাঘের গর্জন।

কথাগুলি গভীরতর অর্থবহ ছিল। এভাবেই কিছুকিছু কথা প্রতীক হয়ে ওঠে। আর প্রতীকগুলির জোড়াতাপ্পিই একেকটি লোকায়ত কিংবদন্তী। দ্রুত লোকের মুখে মুখে কিংবদন্তীটি গড়ে উঠছিল।

বন্দুক, ত্রিশূল, ছেঁড়া শাড়ি, বাঘের গর্জন। দেবী অরণ্যানীর পাটায় মা পাপ করেছিল। কুপিতা দেবী প্রলয়ঙ্কর বন্যায় পাপ ধুয়ে দিয়েছিলেন। মায়ের মেয়ে সেই পাটায় এসে মায়ের মতোই পাপ করেছিল। এবার দেবীর বাহন গর্জন করে

ঝাঁপ দিয়েছিল। তবে হরনাথ ছিলেন ধূর্ত লোক। তাঁর নাতি ইন্দ্রনাথ নির্বোধ জংলি গোঁয়ার। প্রাণটা বেঘোরে খোয়াল। বীরহাটায় হুজুগে আমোদবাজরা বলছিল, জঙ্গলে পশুপাখি জোড় বাঁধে। জঙ্গল জোড়বাঁধার জায়গা। মানুষ-মানুষী জোড় বেঁধেছিল দেবীর পাটায়। সেই সময় দেবীর বাহন ঝাঁপ দিয়েছে। দাঁতে ও থাবায় ফালাফালা করে ছিড়ে খেয়েছে।

দেওয়ান চিন্তামণির হাতে বন্দুক। পাইক-বরকন্দাজদের সশস্ত্র বাহিনী নিয়ে তিনি ছুটে গেছেন। বীরহাটার হুজুগে লোকেরাও লাঠি-বল্লম হাতে চলে গেছে। কুলখাড়ি শেতলদ মধুঝাড়া আহিরডি থেকে দলে দলে দুর্ধর্ষ সশস্ত্র মানুষজনও দেবীর জঙ্গলের চারদিক ঘিরে দাঁড়িয়ে আছে। দেওয়ানবাবু পৌঁছেই বুদ্ধি খাটিয়ে হুকুম দিলেন, উলুকাশের খড় কেটে চারদিক ঘিরে পাঁজা সাজাতে হবে। কাছাকাছি বিস্তীর্ণ উলুকাশের বন। লোকেরা ছুটে গেল। হল্লা শুনে বাঘটি মুহুর্মুহু গর্জন করছিল। যেদিকে বেরুতে যায়, মানুষের পাঁচিল আর ঢাকঢোল ঝাঁঝ ক্যানেস্তারার বিকট শব্দর সঙ্গে মেশা মানুষের পাল্টা গর্জন। ক্রমে সে কোণঠাসা হয়েছিল। আহত, বুড়ো বাঘটি বড় ক্লান্ত। ঘন বেতের জঙ্গলে আত্মগোপন করেছিল। সে জানত না কী করেছে এবং এও জানত না সে দেবী অরণ্যানীর বাহন। আজ দুপুরে জঙ্গলে উদ্দাম বাতাস বইছিল। বৃক্ষলতা থেকে দেবীর কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হচ্ছিল, 'মর্ মর্ মর্!' বাঘটি বুঝতে পারেনি।

বুঝতে পারেনি প্রজ্ঞাও। মায়ের বিধ্বস্ত পাটায় চাপচাপ রক্ত আর পড়ে থাকা একটি বন্দুক দেখে সে যখন 'ইন্দ্র' বলে চিৎকার করে ওঠে, তখনও আলোড়িত বৃক্ষলতার কণ্ঠে শ্বাসপ্রশ্বাসময় ওই ধিক্কার-ধ্বনিগুলি ছিল, 'মর্ মর্, মর্!' একটানে ত্রিশূলটি উপড়ে নিয়েছিল সে। বাঘের গর্জন শুনেছিল।

শুকনো নদীগর্ভে, পাড়ে বাঁধের ওপর কাতারে-কাতারে মানুষজন হেঁটে যাচ্ছিল অন্নদারানীর জঙ্গলের দিকে। সেই ভিড়ে মজহারউদ্দিন হারিয়ে ফেললেন পণ্ডিত গণেশ লালকর শাস্ত্রীকে। থমকে দাঁড়িয়ে তাঁকে খুঁজছেন, এমন সময় গুনু বলে উঠল, 'ওই দেখুন ধোঁয়া। বোধ করি জঙ্গলে আগুন দিয়েছে।'

মজহারউদ্দিন নদীর বাঁকের দিকে দুরে আকাশে ঘন ধোঁয়া দেখতে পেলেন।

অন্নদার জঙ্গলে চারিদিক থেকে দাউদাউ আগুন। জঙ্গলের মাটিতে শুকনো পাতার স্তূপ ছিল। উজ্জ্বল সবুজ বৃক্ষলতা বর্ণাঢ্য পুষ্পসজ্জায় রূপসী হয়ে উঠেছিল। অন্নদারানী, নাকি হীরা বাঈ, অথবা দেবী অরণ্যানী দাঁড়িয়ে ছিলেন সমস্ত কলঙ্ককে পায়ের তলায় চেপে। পৃথিবীর জৈব নিষ্ঠুরতাগুলি ক্রমে তাঁকে ঘিরে ধরে জ্বালিয়ে দিল বিশাল এক সৌন্দর্যকে।

নদীর বাঁকের মুখে পাড়ে উঠে মজহারউদ্দিন খান থমকে দাঁড়ালেন। দূরে উঁচু টাঁড়ের প্রজ্জ্বলন্ত জঙ্গলটি অসহ্য লাগল। গুনু বলল, 'যাবেন না ওস্তাদজি ?'

মজহারউদ্দিন শুধু বললেন, 'জ্বলে গেল সব !'

পাটোয়ারিজি তাঁর গদির কাছে বটতলায় দাঁড়িয়ে ছিলেন। মজহারউদ্দিনকে দেখে একটু হেসে বললেন, 'জঙ্গল জ্বলে গেল। গিয়েছিলেন নাকি দেখতে ?'

মজহারউদ্দিন বললেন, 'আপনারই যাওয়া উচিত ছিল।'

পাটোয়ারিজি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'আমি কেন যাব ?'

'জঙ্গল জ্বলে গেলে মাটি আবাদি হয়। সোনা ফলে।'

'আপনি ভুল করছেন খানসাহেব ! আমি এ সবে নেই। পণ্ডিতজির বেটিকে দেবীর মন্দির বানিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। বলুন, কী খারাপ কাজ হয়েছে এতে ? কী গলতি সমঝালেন আপনি ?'

'পণ্ডিতজির বেটি আর বেঁচে নেই। কাজেই দেবীর মন্দির গড়ার কথাও আর ওঠে না। তাই না ?'

পাটোয়ারিজি চটে গিয়ে নদীতে দৃষ্টিপাত করলেন। মুখে বিরক্তির ছাপ। জবাব দিলেন না।

'পাটোয়ারিজি !'

'আমার বাত করতে আর ইচ্ছা নেই খানসাহেব ! মেজাজ খারাপ করে দিচ্ছেন সকাল থেকে।'

'পণ্ডিতজি এসেছিলেন আপনার কাছে ?'

'হ্যাঁ। বেটির যা সব ছিল, নিয়ে গেলেন। ঘোড়ার গাড়ি ভাড়া করে দিলাম। রাহাখরচও দিলাম।'

'বেটির দলিল ?'

পাটোয়ারিজি খাপ্পা হয়ে বললেন, 'বেটি দলিল বাঁধা দিয়েছে রণজয়ের কাছে। সকালে আপনাকে সব কথা বলেছি। আবার কেন এ কথা ?'

মজহারউদ্দিন একটু দাঁড়িয়ে থেকে চলে এলেন। বিকেল নেমেছে। বাঁধের পথে যেতে যেতে বহুদূরে পুবের আকাশে অন্নদারানীর পোড়া জঙ্গলের ধোঁয়া লক্ষ করলেন। মনে হল, চিতার ধোঁয়া। অন্যমনস্কভাবে আবার বলে উঠলেন, 'সব জ্বলে গেল !'

বাঁধের কিনারায় ঘাসের ওপর বসে আছেন, গুনু এসে ডাকল, 'ওস্তাদজি !'

'আয় বাপ্ ! বস্ এখানে।'

গুনু একটু তফাতে বসে বলল, 'বাজারে গুজব শুনে এলাম, পণ্ডিতমশাইয়ের মেয়ে নাকি তমসুকে বাহান্নবিঘে মাটি বাঁধা দিয়েছে পাটোয়ারিজিকে। খবর নেওয়া উচিত।'

'দিয়েছে রে! আমারই একটা ভুল।'

'কী ভুল ওস্তাদজি?'

'যা চাপা আছে, চাপা থাক বাপ্! কথা বাড়াসনে।'

গুনু একটু হাসল। 'দেবীর শাপ! আমি বলছি না, লোকের কথা। দেবী অন্নদারানীকে ভর করেছিল। অন্নদারানী জমিদারবুড়োর সঙ্গে পাপ করল। দেবী শাপ দিল। অন্নদারানী ভেসে গেল। তার মেয়েও দেবীর পাটায় পাপ করল। দেবীর বাহন তাকেও...'

'চুপ বে। কান জ্বলে যাচ্ছে।'

'নরসুন্দরের পো। স্বভাব ওস্তাদজি! ক্ষুরের সঙ্গে মুখও চলে।'

'শালা! ক্ষুরে আমাকে ফালাফালি করে দিবি দেখছি!'

গুনু হাসতে লাগল। 'কথায় বলে, লঙ্কাধামে রাবণ মলো/বেহুলা কাঁদে রাঁড়ি হলো। খানকির টাঁড় জ্বলল। তাতে আপনার কী, আমারই বা কী!'

'তোর কিছু নেই রে শালা, আমার আছে।'

গুনু অবাক হয়ে বলল, 'অবেলায় মুখ খিস্তি। হঠাৎ মাথাখারাপ হল কেন গো?'

মজহারউদ্দিন হাত বাড়িয়ে শিষ্যের হাত নিলেন। 'ওস্তাদকে মাফ করে দে বাপ! জঙ্গল জ্বলেনি রে, আমি জ্বলছি। এ আগুন নিভবে না।'

'ওস্তাদজি! কিছু বুঝতে পারছি না।'

গায়ক চোখ মুছে বললেন, 'পণ্ডিতশালা চুপিচুপি এমনি করে পালিয়ে গেল! আসল কথাটা বলার হিম্মত হল না।'

'কী কথা?'

মজহারউদ্দিন রুষ্টও ভিজে চোখে দূরে পোড়া জঙ্গলের ধোঁয়া দেখতে দেখতে বললেন, 'নিজের মেয়ে হলে চলে যেত না। যেতে পারতই না। অথচ এতটুকু থেকে মানুষ করেছিল। শালা জাত-ধর্মের মুখে হিসি করে দিই। মানুষের আবার জাতধর্ম কী রে? মানুষ মানুষ। গুনু, হীরার মেয়ের মাটিতে পাটোয়ারিকে আমি বসতে দেব না। জান কবুল। আমি লড়ব। হীরার জঙ্গল জঙ্গলই থাকবে।'

গুনু চমকে উঠেছিল। বলল, 'হীরা! সে আবার কে?'

গায়ক জবাব দিলেন না স্বরভঙ্গ, তাই গুনগুনিয়ে যে সুরটা ভাঁজতে থাকলেন, তা, কি শাশ্বত এক মানবিক বিষাদের ? স্মৃতি থেকে ধীরে জেগে উঠছিল একটি রাগিনী, যার পায়ের তলায় হরিণেরা খেলা করে। দেবী অরণ্যানী তার অন্য নাম।...

সমাপ্ত